১

নৃবিজ্ঞান পরিচিতি
Introduction to Anthropology

পৃথিবীর বুকে কবে থেকে মানুষের বিচরণ? অন্যান্য প্রাণীর সাথে মানুষের মূল পার্থক্য কি? একই প্রজাতির সদস্য হিসাবে সকল মানুষের অভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি? আবার দৈহিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিচারে মানব জাতির মধ্যে যেসব ভিন্নতা দেখা যায়, সেগুলোর তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা কি? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার প্রয়াসে নৃবিজ্ঞান নামক জ্ঞানকান্ড গড়ে তোলা হয়েছিল। অবশ্য নৃবিজ্ঞানের আবির্ভাবের বহু আগে থেকেই সম্ভবতঃ এসব প্রশ্ন বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন মানব সমাজে উচ্চারিত হয়েছে, স্থান-কাল ভেদে যেগুলোর বিভিন্ন উত্তরও দেওয়া হয়েছে। তবে বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে প্রচলিত উত্তরগুলো যখন আর যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয় নি, তখন একটা পর্যায়ে আবির্ভাব ঘটে নৃবিজ্ঞানের, যার আক্ষরিক অর্থ হল মানুষ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

নৃবিজ্ঞান বিশ্বের সকল স্থানের সকল কালের মানুষ সম্পর্কেই জানতে আগ্রহী। নৃবিজ্ঞানীদের চোখে মানুষ হচ্ছে একটা বিশেষ ধরনের জীব, যার সংস্কৃতি ধারণ করার ক্ষমতা তাকে জীবজগতে অনন্যতা দিয়েছে। নৃবিজ্ঞানীরা জানতে চায় কিভাবে কবে থেকে মানুষ এই ক্ষমতা অর্জন করল। অন্যদিকে সংস্কৃতি কোন স্থির বিষয় নয়, স্থান-কাল ভেদে এর বিবিধ রূপ দেখা গেছে। কাজেই নৃবিজ্ঞানীরা জানার চেষ্টা করেছে, সংস্কৃতির পরিবর্তন কখন কিভাবে ঘটে, সংস্কৃতির একাধিক ভিন্ন রূপের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য কতটুকু, ইত্যাদি। নৃবিজ্ঞানের একেকটা শাখায় একেক ধরনের প্রশ্ন প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন, দৈহিক নৃবিজ্ঞানে মূলতঃ প্রাণী হিসাবে মানুষের বৈশিষ্ট্য ও তার উৎপত্তির ইতিহাস অধ্যয়ন করা হয়। সামাজিক/সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে নজর দেওয়া হয় মানব সমাজ ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য অধ্যয়নের উপর। প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানে নজর দেওয়া হয় অতীতের মানুষদের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার উপর।

এই ইউনিটে আপনি একটি জ্ঞানকান্ড হিসাবে নৃবিজ্ঞান সম্পর্কে সাধারণভাবে ধারণা লাভ করবেন এবং এর প্রধান শাখাগুলোর সাথে পরিচিত হবেন। এছাড়া নৃবিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস, অন্যান্য জ্ঞানকান্ডের সাথে এর সম্পর্ক, এবং সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান নামে পরিচিত এর বিশেষ শাখায় ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে আপনি জানতে পারবেন।

- পাঠ - ১ : নৃবিজ্ঞানের সংজ্ঞা
- পাঠ - ২ : দৈহিক নৃবিজ্ঞান
- পাঠ - ৩ : সামাজিক/সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান
- পাঠ - ৪ : প্রত্নতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব
- পাঠ - ৫ : নৃবিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশ
- পাঠ - ৬ : নৃবিজ্ঞান ও অন্যান্য জ্ঞানকান্ড
- পাঠ - ৭ : সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে গবেষণা পদ্ধতি

নৃবিজ্ঞানের সংজ্ঞা
Definition of Anthropology

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন-

- নৃবিজ্ঞানের সংজ্ঞা
- নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা
- নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বা উপবিভাগ
- নৃবিজ্ঞানের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

নৃবিজ্ঞান কি ধরনের বিজ্ঞান?

নৃবিজ্ঞানে একাধারে মানব সত্তার জৈবিক ও সাংস্কৃতিক স্বরূপ অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়, এবং তা করতে গিয়ে এর অনুসন্ধিৎসার ক্ষেত্র বিস্তৃত রয়েছে এক বিশাল পটভূমি জুড়ে, যার আওতায় পড়ে সুদূর প্রাগৈতিহাসিক অতীত থেকে শুরু করে এ যাবত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যত ধরনের মানবগোষ্ঠী বাস করে গেছে বা করছে, সবাই।

'নৃবিজ্ঞান' হল ইংরেজী 'এ্যান্থ্রোপলজি'-র (anthropology) বাংলা প্রতিশব্দ। এ্যান্থ্রোপলজি কথাটির মূলে রয়েছে একটি গ্রীক শব্দ ' এ্যান্থ্রোপস' (anthropos), যার অর্থ মানুষ। সংস্কৃত শব্দ 'নৃ' মানেও তাই। কাজেই 'নৃবিজ্ঞান' কথাটির অর্থ দাঁড়ায় 'মানব বিষয়ক বিজ্ঞান' (উল্লেখ্য, বাংলায় এ্যান্থ্রোপলজির প্রতিশব্দ হিসাবে মানব বিজ্ঞান কথাটি কেউ কেউ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তা বহুল প্রচলিত নয়)। তবে ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্রসহ আরো অনেক শাস্ত্র বা জ্ঞানকান্ড রয়েছে, যেগুলোও কোন না কোনভাবে মানব বিষয়ক বিজ্ঞান বটে। কাজেই শুধুমাত্র 'মানব বিষয়ক বিজ্ঞান' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করলে নৃবিজ্ঞানকে আলাদা করে চেনা যায় না। নৃবিজ্ঞানের বিশেষত্ব এই যে, মানব বিষয়ক অন্যান্য বিজ্ঞানের তুলনায় এর বিষয়বস্তু ব্যাপকতর পরিধিসম্পন্ন ও অধিকতর বৈচিত্র্যপূর্ণ। নৃবিজ্ঞানে একাধারে মানব সত্তার জৈবিক ও সাংস্কৃতিক স্বরূপ অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়, এবং তা করতে গিয়ে এর অনুসন্ধিৎসার ক্ষেত্র বিস্তৃত রয়েছে এক বিশাল পটভূমি জুড়ে, যার আওতায় পড়ে সুদূর প্রাগৈতিহাসিক অতীত থেকে শুরু করে এ যাবত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যত ধরনের মানবগোষ্ঠী বাস করে গেছে বা করছে, সবাই।

'নৃবিজ্ঞান'-এর পরিবর্তে 'নৃতত্ত্ব' কথাটি আপনাদের কাছে অধিকতর পরিচিত হতে পরে। 'এ্যান্থ্রোভসজি'র প্রতিশব্দ হিসেবে শেষোক্ত শব্দটি বাংলা ভাষায় চালু রয়েছে দীর্ঘতর সময় ধরে (ক্ষেত্রবিশেষে 'নৃবিদ্যা' শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে)। আপনি হয়তবা লক্ষ্য করেছেন যে, বাংলা ভাষায় রচিত অনেক বইপুস্তক বা পত্রপত্রিকায় বিশেষ কোন জনগোষ্ঠীর প্রেক্ষিতে 'নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য' বা 'নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস' ইত্যাদি কথা ব্যবহার করা হয়, যেগুলি দিয়ে সাধারণভাবে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর বাহ্যিক দৈহিক বৈশিষ্ট্য বা প্রাগৈতিহাসিক অতীত সংক্রান্ত বিষয়াদি আলোচনায় নিয়ে আসা হয়। এক্ষেত্রে 'নৃতাত্ত্বিক' বিশেষণটা এমন সব বিষয়কে নির্দেশ করে যেগুলো নিয়ে নৃবিজ্ঞানের কোন কোন শাখায়--বিশেষ করে দৈহিক নৃবিজ্ঞান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানে--হয়ত একসময় ব্যাপক গবেষণা বা লেখালেখি হয়েছে, কিন্তু শুধুমাত্র এসব বিষয় দিয়ে নৃবিজ্ঞানের পুরো পরিচয় পাওয়া যায় না। সেদিক থেকে 'নৃতত্ত্ব' পদটি, বা এর বিশেষণরূপ 'নৃতাত্ত্বিক', যেভাবে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, তা সমকালীন প্রেক্ষাপটে যথার্থ নয়।

'নৃতত্ত্ব' পদটি, বা এর বিশেষণরূপ 'নৃতাত্ত্বিক', যেভাবে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, তা সমকালীন প্রেক্ষাপটে যথার্থ নয়।

এ্যান্থ্রোপলজির অপেক্ষাকৃত পুরানো প্রতিশব্দ 'নৃতত্ত্ব' বাংলা ভাষায় যে সময় চালু হয়েছিল, তখন ইউরোপ ও আমেরিকাতেও এমন একটা ধারণা ব্যাপকভাবে চালু ছিল যে এটি হচ্ছে এমন একটি বিজ্ঞান যেখানে মূলতঃ মানব জাতির উৎপত্তি ও বিবর্তন, বিভিন্ন ধরনের মানবগোষ্ঠীর দৈহিক বৈশিষ্ট্যের তারতম্য, এবং 'আদিম' সমাজ বা সংস্কৃতি অধ্যয়ন করা হয়। এ ধরনের ধারণা একেবারে ভিত্তিহীন ছিল না, কারণ বিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত মূলতঃ উল্লিখিত বিষয়গুলোর উপরই 'নৃতাত্ত্বিক' গবেষণা ও লেখালেখির ঝোঁক বেশী ছিল।। তবে সময়ের সাথে সাথে এই প্রবণতা পাল্টে গেছে, এবং নৃতাত্ত্বিক অধ্যয়নের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও

বিষয়বস্তুকে অনেকটাই ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সমকালীন প্রেক্ষাপটে নৃতত্ত্ব মানেই মানুষের উৎপত্তির ইতিহাস বা আদিম সমাজ অধ্যয়ন, একথা আর বলা যায় না। এখনকার নৃতত্ত্ববিদদের অনেকেই অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানীদের মতই সমকালীন বিভিন্ন ধরনের সমাজ, তাদের সংস্কৃতি-অর্থনীতি-রাজনীতি ইত্যাদি নানান বিষয়ে গবেষণা ও লেখালেখি করছেন। আর এই পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে 'নৃতত্ত্ব'র বদলে 'নৃবিজ্ঞান'ই 'এ্যান্থ্রোপলজি'র প্রতিশব্দ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিশেষ করে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এ বিষয় পড়ানো শুরু হওয়ার সময় থেকে। একইভাবে নৃবিজ্ঞান চর্চার সাথে যুক্ত শিক্ষক-গবেষকরা 'নৃতত্ত্ববিদ'-এর বদলে 'নৃবিজ্ঞানী' হিসাবেই নিজেদের পরিচয় দিচ্ছেন।

সমকালীন প্রেক্ষাপটে নৃবিজ্ঞান হচ্ছে বিভিন্ন উপবিভাগ সম্বলিত এমন একটি জ্ঞানকান্ড যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 'মানুষ'কে অধ্যয়ন করে।

সাধারণভাবে বলা যায়, সমকালীন প্রেক্ষাপটে নৃবিজ্ঞান হচ্ছে বিভিন্ন উপবিভাগ সম্বলিত এমন একটি জ্ঞানকান্ড যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 'মানুষ'কে অধ্যয়ন করে। আগেই বলা হয়েছে, নৃবিজ্ঞানে একাধারে মানব সত্তার জৈবিক ও সাংস্কৃতিক স্বরূপ অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়। একটি প্রজাতি হিসেবে মানুষের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস থেকে শুরু করে অতীত ও বর্তমানকালের বিভিন্ন ধরনের মানব সমাজের সংস্কৃতি-অর্থনীতি-রাজনৈতিক সংগঠন প্রভৃতির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের তুলনামূলক অধ্যয়ন নৃবিজ্ঞানে করা হয়। বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক থেকে বিশাল পরিধির অধিকারী এই জ্ঞানকান্ডের স্বভাবতই রয়েছে বিভিন্ন উপবিভাগ ও বিশেষায়িত ক্ষেত্র। তবে দেশ-কাল ভেদে এই উপবিভাগগুলোর নামকরণ ও শ্রেণীকরণে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়।

মার্কিন ধারার নৃবিজ্ঞানে সচরাচর চারটি প্রধান উপবিভাগ চিহ্নিত করা হয়, এগুলি হল, সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান, প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান, ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান ও দৈহিক নৃবিজ্ঞান।

মার্কিন ধারার নৃবিজ্ঞানে সচরাচর চারটি প্রধান উপবিভাগ চিহ্নিত করা হয়, এগুলি হল, সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান, প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান, ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান ও দৈহিক নৃবিজ্ঞান। অনেকে অবশ্য প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানকে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানেরই দুটি শাখা হিসাবে গণ্য করেন এবং ethnology বা জাতিতত্ত্ব নামে এর আরেকটি শাখা চিহ্নিত করেন। ব্রিটিশ তথা ইউরোপীয় ধারার নৃবিজ্ঞানে 'সংস্কৃতি' ধারণার চাইতে 'সমাজ' ধারণার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, ফলে এই প্রেক্ষিতে 'সামাজিক নৃবিজ্ঞান' কথাটি অধিকতর প্রচলিত। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সসহ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত নৃবিজ্ঞান চর্চার প্রধান কেন্দ্রগুলোর মধ্যে বরাবরই বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ ছিল, কাজেই স্থান-কাল ভেদে বিভিন্ন নামে পরিচিত নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারা-উপধারার মধ্যে সবক্ষেত্রে কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা যায় না। সাম্প্রতিক কালে বিশ্বের অনেক স্থানেই মার্কিন ধারার সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান ও ব্রিটিশ ধারার সামাজিক নৃবিজ্ঞানকে মূলতঃ একই বৃহত্তর ধারার অন্তর্গত হিসাবে গণ্য করা হয়, যাকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান হিসাবে অনেকে অভিহিত করে থাকেন। সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান তথা নৃবিজ্ঞানের অন্যান্য উপবিভাগের সাথে অন্যান্য জ্ঞানকান্ডের মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে বিষয়-ভিত্তিক গবেষণার অনেক বিশেষায়িত ক্ষেত্র, যেমন, অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান, রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান, ধর্মের নৃবিজ্ঞান, প্রতিবেশগত নৃবিজ্ঞান, চিকিৎসা নৃবিজ্ঞান, ফলিত নৃবিজ্ঞান ইত্যাদি।

নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী

বিভিন্ন নামে অভিহিত নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন উপবিভাগ ও বিশেষায়িত ধারার মধ্যে সাধারণভাবে কিছু অভিন্ন যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। এগুলোর মধ্যে সংস্কৃতি ধারণার ব্যবহার, সমগ্রবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, মাঠকর্ম ও তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন নামে অভিহিত নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন উপবিভাগ ও বিশেষায়িত ধারার মধ্যে সাধারণভাবে কিছু অভিন্ন যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। এগুলোর মধ্যে সংস্কৃতি ধারণার ব্যবহার, সমগ্রবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, মাঠকর্ম ও তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। এসব মিল নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন উপবিভাগ ও বিশেষায়িত ক্ষেত্রগুলোকে একত্রে একটি সমন্বিত ও স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত জ্ঞানকান্ড হিসাবে পরিচিতি দিয়েছে। এছাড়া অনেক জায়গায়, বিশেষ করে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, নৃবিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চতর পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের নৃবিজ্ঞানের একাধিক শাখার উপর প্রশিক্ষণ দেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। ফলে এখনো অনেক

নৃবিজ্ঞানীই তাঁদের গবেষণা ও লেখালেখিতে এক ধরনের সমন্বিত 'নৃবৈজ্ঞানিক' দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণের চেষ্টা করেন। নীচে একটি সমন্বিত জ্ঞানকান্ড হিসাবে নৃবিজ্ঞানের উল্লিখিত প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হল।

সংস্কৃতির ধারণার তাৎপর্য : নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাতেই 'সংস্কৃতি' একটি কেন্দ্রীয় ধারণা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শুধু সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে নয়, দৈহিক নৃবিজ্ঞান, প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান ও ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানেও সংস্কৃতির ধারণা ব্যবহার করা হয়। প্রচলিত অর্থে সংস্কৃতি বলতে যা বোঝাত--নৃত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি--নৃবিজ্ঞানীরা তার থেকে ভিন্ন ও ব্যাপকতর অর্থে শব্দটি ব্যবহার শুরু করেছিলেন বেশ আগে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড টায়লর সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এভাবে: 'সংস্কৃতি হচ্ছে সেই জটিল সমগ্র, যার আওতায় পড়ে জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নৈতিকতা, আইন, প্রথা এবং অন্য যে কোন কর্মদক্ষতা ও অভ্যাস যা মানুষ সমাজের সদস্য হিসাবে অর্জন করে'। টায়লর পরে অন্য নৃবিজ্ঞানীরা মিলে সংস্কৃতির শতাধিক সংজ্ঞা দিয়েছেন, যা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় তাদের কাছে এই ধারণা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। নৃবিজ্ঞানে সংস্কৃতির ধারণার দুই ধরনের তাৎপর্য রয়েছে। একদিকে একটি প্রজাতি হিসাবে জীবজগতে মানুষের অনন্যতা বোঝানোর জন্য সংস্কৃতির ধারণা ব্যবহার করা হয়: নৃবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে প্রাণীজগতে একমাত্র মানুষেরই রয়েছে সংস্কৃতি ধারণ করার ক্ষমতা, এবং এই সাধারণ অর্থে মানুষ মাত্রই সংস্কৃতিসম্পন্ন (এই সাধারণ অর্থে ইংরেজীতে সংস্কৃতির ধারণা ব্যবহার করা হয় একবচনে, যা অনেক সময় বড় হাতের C দিয়ে লেখা হয়: Culture)। অন্যদিকে বিভিন্ন মানব সমাজের ভিন্নতার সূচক হিসাবেও সংস্কৃতির ধারণা ব্যবহার করা হয়: প্রতিটা সমাজেরই রয়েছে নিজস্ব কিছু রীতি-নীতি, আচার-প্রথা ইত্যাদি, অর্থাৎ সংস্কৃতির একটি নির্দিষ্ট নিজস্ব রূপ। কাজেই সমাজ ভেদে সংস্কৃতিরও ভিন্নতা দেখা যায় (এই অর্থে ইংরেজীতে সংস্কৃতির ধারণা ব্যবহার করা হয় বহুবচনে, যা লেখা হয় ছোট হাতের c দিয়ে: cultures) ।

ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড টায়লর সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এভাবে: 'সংস্কৃতি হচ্ছে সেই জটিল সমগ্র, যার আওতায় পড়ে জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নৈতিকতা, আইন, প্রথা এবং অন্য যে কোন কর্মদক্ষতা ও অভ্যাস যা মানুষ সমাজের সদস্য হিসাবে অর্জন করে'।

সমগ্রবাদী দৃষ্টিভঙ্গী: নৃবিজ্ঞানের কোন একটি বিশেষায়িত ধারায় মানব জীবনের নির্দিষ্ট কোন দিক অধ্যয়নের উপর নজর দেওয়া হলেও সাধারণত তা বিচ্ছিন্নভাবে করা হয় না, বরং মানব জীবনের একটা দিক কিভাবে অন্যান্য দিকগুলোর সাথে সম্পর্কিত, তাও দেখার চেষ্টা করা হয়। কাজেই বলা হয় যে, নৃবিজ্ঞানীরা সমগ্রবাদী বা পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গী (holistic perspective) অনুসরণের চেষ্টা করেন, অর্থাৎ তারা মানুষ ও তার সংস্কৃতি বা সমাজের কোন অংশকে খন্ডিতভাবে না দেখে সমগ্রের আলোকে সেটাকে অনুধাবনের চেষ্টা করেন।

মাঠকর্ম : ঐতিহ্যগতভাবে বিভিন্ন শাখার নৃবিজ্ঞানেই মাঠকর্ম অর্থাৎ প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। যেমন, দৈহিক নৃবিজ্ঞানীরা মানব জীবাশ্মের সন্ধানে বা প্রাণীজগতে মানুষের নিকটতম প্রজাতিদের সামাজিক আচরণ পর্যবেক্ষণের জন্য মাঠকর্ম সম্পাদন করেন। প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানীরা খননকার্যের মাধ্যমে অতীতের কোন জনপদের সন্ধান পেলে সেখান থেকে বিস্তারিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন। সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা দীর্ঘমেয়াদী প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এক একটা সমাজের বিস্তারিত বিবরণ তৈরী করেন। এভাবে নৃবিজ্ঞানের প্রতিটা শাখাতেই ক্ষুদ্র পরিসরে নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয়।

তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী : নৃবিজ্ঞানের সকল শাখাতেই বিভিন্ন কালের ও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহের তুলনামূলক অধ্যয়ন করা হয়। বিভিন্ন কালের ও বিভিন্ন স্থানের মানুষদের জৈবিক বা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নৃবিজ্ঞানীরা জানার চেষ্টা করেন কি কি বৈশিষ্ট্য সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এবং কি কি বৈশিষ্ট্য শুধু নির্দিষ্ট কিছু মানবগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিভিন্ন জ্ঞানকান্ডের মধ্যে একমাত্র নৃবিজ্ঞানেই দেখা যায় স্থান ও কালের দিক থেকে মানব

বৈচিত্র্যের সমগ্র পরিধিকে বিবেচনায় নিয়ে বিশেষ কোন আলোচ্য বিষয়ের উপর আলোকপাত করার প্রচেষ্টা।

উপরের আলোচনায় নৃবিজ্ঞানের সনাতনী বৈশিষ্ট্যসমূহের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এখানে একথাও যোগ করা দরকার যে, নৃবিজ্ঞানকে মানব বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান বলার রেওয়াজ থাকলেও বাস্তবে অবশ্য প্রায় কোন নৃবিজ্ঞানীকেই বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি এর সকল শাখায় সমান জ্ঞান বা আগ্রহ নিয়ে বিচরণ করেন। অতীতে যখন নৃবিজ্ঞানীদের নজর কেন্দ্রীভূত ছিল তথাকথিত আদিম জনগোষ্ঠীসমূহের প্রতি, তখন হয়ত একই নৃবিজ্ঞানী নির্দিষ্ট কোন জনগোষ্ঠীর প্রেক্ষিতে একাধারে তাদের প্রাক-ইতিহাস থেকে শুরু করে ভাষা, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি ইত্যাদি অধ্যয়ন করতেন। তবে এ ধরনের উদাহরণ বর্তমানে বিরল। অতীতে আদিম বলে বিবেচিত বিভিন্ন সমাজ অধ্যয়নের ব্যাপারে আগ্রহের ব্যাপকতা নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে যতটা সমন্বিত রাখতে সহায়তা করেছিল, বর্তমানে সে অবস্থা আর নেই। কাজেই সাম্প্রতিককালে নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে কিছুটা দূরত্ব বিরাজ করছে, যে কারণে 'নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী' বলে অভিন্ন কোন কিছু আছে, এ ব্যাপারে সকল নৃবিজ্ঞানী হয়ত সহজে একমত হবেন না।

অতীতে আদিম বলে বিবেচিত বিভিন্ন সমাজ অধ্যয়নের ব্যাপারে আগ্রহের ব্যাপকতা নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে যতটা সমন্বিত রাখতে সহায়তা করেছিল, বর্তমানে সে অবস্থা আর নেই। কাজেই সাম্প্রতিককালে নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে কিছুটা দূরত্ব বিরাজ করছে, যে কারণে 'নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী' বলে অভিন্ন কোন কিছু আছে, এ ব্যাপারে সকল নৃবিজ্ঞানী হয়ত সহজে একমত হবেন না।

সারাংশ

'নৃবিজ্ঞান' হল ইংরেজী 'এ্যান্থ্রোপলজি'-র (anthropology) বাংলা প্রতিশব্দ। এ্যান্থ্রোপলজি কথাটির মূলে রয়েছে একটি গ্রীক শব্দ ' এ্যান্থ্রোপস' (anthropos), যার অর্থ মানুষ। সংস্কৃত শব্দ 'নৃ' মানেও তাই। কাজেই 'নৃবিজ্ঞান' কথাটির অর্থ দাঁড়ায় 'মানব বিষয়ক বিজ্ঞান' । মানব বিষয়ক অন্যান্য বিজ্ঞানের তুলনায় এর বিষয়বস্তু ব্যাপকতর পরিধিসম্পন্ন ও অধিকতর বৈচিত্র্যপূর্ণ। সমকালীন প্রেক্ষাপটে নৃবিজ্ঞান হচ্ছে বিভিন্ন উপবিভাগ সম্বলিত এমন একটি জ্ঞানকান্ড যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 'মানুষ'কে অধ্যয়ন করে। নৃবিজ্ঞানে একাধারে মানব সত্তার জৈবিক ও সাংস্কৃতিক স্বরূপ অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়। একটি প্রজাতি হিসেবে মানুষের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস থেকে শুরু করে অতীত ও বর্তমানকালের বিভিন্ন ধরনের মানব সমাজের সংস্কৃতি-অর্থনীতি-রাজনৈতিক সংগঠন প্রভৃতির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের তুলনামূলক অধ্যয়ন নৃবিজ্ঞানে করা হয়। বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক থেকে বিশাল পরিধির অধিকারী এই জ্ঞানকান্ডের স্বভাবতই রয়েছে বিভিন্ন উপবিভাগ ও বিশেষায়িত ক্ষেত্র। মার্কিন ধারার নৃবিজ্ঞানে সচরাচর চারটি প্রধান উপবিভাগ চিহ্নিত করা হয়, এগুলি হল, সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান, প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান, ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান ও দৈহিক নৃবিজ্ঞান। ব্রিটিশ তথা ইউরোপীয় ধারার নৃবিজ্ঞানে 'সংস্কৃতি' ধারণার চাইতে 'সমাজ' ধারণার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, ফলে এই প্রেক্ষিতে 'সামাজিক নৃবিজ্ঞান' কথাটি অধিকতর প্রচলিত। সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান তথা নৃবিজ্ঞানের অন্যান্য উপবিভাগের সাথে অন্যান্য জ্ঞানকান্ডের মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে বিষয়-ভিত্তিক গবেষণার অনেক বিশেষায়িত ক্ষেত্র, যেমন, অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান, রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান, ধর্মের নৃবিজ্ঞান, প্রতিবেশগত নৃবিজ্ঞান, চিকিৎসা নৃবিজ্ঞান, ফলিত নৃবিজ্ঞান ইত্যাদি। বিভিন্ন নামে অভিহিত নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন উপবিভাগ ও বিশেষায়িত ধারার মধ্যে সাধারণভাবে কিছু অভিন্ন যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। এগুলোর মধ্যে সংস্কৃতি ধারণার ব্যবহার, সমগ্রবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, মাঠকর্ম ও তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন -

১। নৃবিজ্ঞান হল
- ক. মানব বিষয়ক একমাত্র বিজ্ঞান
- খ. সকল কালের সকল স্থানের মানুষদের অধ্যয়নে আগ্রহী একটি সমন্বিত শাস্ত্র
- গ. নৃতত্ত্ব হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন
- ঘ. মূলতঃ মানুষে মানুষে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের তারতম্য অধ্যয়নের বিজ্ঞান

২। নৃবিজ্ঞানের মোট কয়টি উপবিভাগ রয়েছে?
- ক. দুইটি
- খ. চারটি
- গ. অসংখ্য
- ঘ. স্থান-কাল-পাত্র ভেদে হিসাবটা বিভিন্নভাবে দেওয়া হয়

৩। নৃবিজ্ঞানে সংস্কৃতি ধারণা দিয়ে বোঝানো হয়
- ক. নৃত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়কে
- খ. শিক্ষিত ও সুসভ্য মানুষদের চালচলনকে
- গ. সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি, আচার-প্রথা ইত্যাদির সামগ্রিক রূপকে
- ঘ. মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিকে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। সমগ্রবাদী দৃষ্টিভঙ্গী কী?

২। তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। একটি জ্ঞানকান্ড হিসাবে নৃবিজ্ঞানের পরিচয় দিন।

২। নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলো কি কি? এগুলোকে কি সবসময় একইভাবে শ্রেণীকরণ করা হয়?

৩। নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী বলতে কী বোঝায়?

পাঠ - ২

দৈহিক নৃবিজ্ঞান
Physical Anthropology

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- দৈহিক নৃবিজ্ঞানে অধীত বিষয়সমূহ
- দৈহিক নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে মানব বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা
- অন্যান্য প্রাণীর সাথে মানুষের সম্পর্ক অধ্যয়নের প্রেক্ষাপট
- বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যেকার শারীরিক ও অন্যান্য জৈবিক পার্থক্য
- দৈহিক নৃবিজ্ঞানীদের পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে ধারণা পাবেন

দৈহিক নৃবিজ্ঞানে যেসব বিষয় অধ্যয়ন করা হয় সেগুলির মধ্যে রয়েছে একটি প্রজাতি হিসাবে মানুষের উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস, জৈবিক বৈশিষ্ট্যের বিচারে মানুষের নিকটতম প্রাণীদের সাথে মানুষের মিল ও অমিল, এবং দৈহিক ও অন্যান্য জৈবিক বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে মানবজাতির মধ্যেকার বৈচিত্র্য।

দৈহিক নৃবিজ্ঞানে যেসব বিষয় অধ্যয়ন করা হয় সেগুলির মধ্যে রয়েছে একটি প্রজাতি হিসাবে মানুষের উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস, জৈবিক বৈশিষ্ট্যের বিচারে মানুষের নিকটতম প্রাণীদের সাথে মানুষের মিল ও অমিল, এবং দৈহিক ও অন্যান্য জৈবিক বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে মানবজাতির মধ্যেকার বৈচিত্র্য। বিষয়বস্তুর কারণে জীববিজ্ঞানের মৌলিক অনেক বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হয় দৈহিক নৃবিজ্ঞানীদের। সেসাথে মানব সত্তার জৈবিক ও সাংস্কৃতিক উভয় মাত্রার পারস্পরিক সম্পর্ককে নিয়ত বিবেচনায় রাখার তাগিদে নৃবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার বিভিন্ন প্রত্যয় ও তত্ত্ব সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞান রাখতে হয় তাদের।

চার্লস ডারউইন যখন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই তত্ত্ব দেন যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ক্রমরূপান্তরের মাধ্যমে পৃথিবীতে জীবজগতের বিভিন্ন প্রজাতির আবির্ভাব ঘটেছে, তখন ধর্মীয় ব্যাখ্যার বাইরে মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার একটা দিকনির্দেশনা পাওয়া গিয়েছিল। ততদিনে ভূত্বকের বিভিন্ন গভীর স্তর থেকে বিলুপ্ত অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবাশ্মের সন্ধান মিলতে শুরু করেছিল, যেগুলির মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ ও মানব-সদৃশ প্রাণীদের নমুনাও যুক্ত হচ্ছিল (জীবাশ্ম বা fossil হল লক্ষ-কোটি বছর আগেকার কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহাবশেষ, যা বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে শিলীভূত রূপে ভূত্বকের বিশেষ কোন স্তরে সংরক্ষিত থেকে গেছে)। একটা সময়ে এই ধারণা ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, জীবজগতের অন্যান্য প্রজাতির মত মানুষও বিবর্তনের মাধ্যমেই আজকের রূপে এসে উপনীত হয়েছে।

দৈহিক নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা মানব বা মানবসদৃশ প্রাণীদের জীবাশ্ম নিয়ে কাজ করেন, তাঁদের লক্ষ্য হল প্রাপ্ত নমুনাসমূহের ভিত্তিতে মানব বিবর্তনের ইতিহাসের একটা চিত্র দাঁড় করানো।

দৈহিক নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা মানব বা মানবসদৃশ প্রাণীদের জীবাশ্ম নিয়ে কাজ করেন, তাঁদের লক্ষ্য হল প্রাপ্ত নমুনাসমূহের ভিত্তিতে মানব বিবর্তনের ইতিহাসের একটা চিত্র দাঁড় করানো। তাঁদের গবেষণার ভিত্তিতে বলা যায়, আজ থেকে আনুমানিক বিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে মানবসদৃশ কিছু প্রাণীর বিচরণ ছিল যেগুলোর মগজের গড় আয়তন মানুষের চাইতে শিম্পাজী-গরিলাদের মত প্রাণীর কাছাকাছি হলেও অন্যান্য দিক থেকে তারা মানুষের মতই ছিল: যেমন তারা দু'পায়ের উপর ভর করে খাড়া হয়ে চলাফেরা করত, এবং খুব সরল ধরনের পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করত। এই প্রাণীদের নাম দেওয়া হয়েছে অস্ট্রালোপিথেকাস (*australopithecus* ল্যাটিন ভাষায় *australo-* বলতে দক্ষিণাঞ্চলীয় এবং *pithecus* বলতে ape শ্রেণীর বানর অর্থাৎ শিম্পাজি, গরিলা প্রভৃতি লাঙ্গুলবিহীন বানরদের বোঝায়। অস্ট্রালোপিথেকাসদের প্রথম নমুনা পাওয়া গিয়েছিল আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ

ধারণা করা হয়, অস্ট্রালোপিথেকাস বর্গের প্রাণীদেরই কোন শাখা থেকে আধুনিক মানুষের পূর্বসূরী প্রজাতিসমূহের উৎপত্তি ঘটেছে।

ভাগে, তাই এই নাম করণ)। ধারণা করা হয়, অস্ট্রালোপিথেকাস বর্গের প্রাণীদেরই কোন শাখা থেকে আধুনিক মানুষের পূর্বসূরী প্রজাতিসমূহের উৎপত্তি ঘটেছে। অস্ট্রালোপিথেকাসদের চাইতে বেশী আয়তনের মস্তিস্কসম্পন্ন আদি-মানবদের উৎপত্তি ঘটে আনুমানিক দশ থেকে বিশ লক্ষ বছর আগে। এদের মধ্যে হোমো ইরেকটাস নামে অভিহিত (*homo erectus*; গ্রীক শব্দ *homo* অর্থ মানুষ) প্রজাতির আদি-মানবদের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায়। জাভা মানব, পিকিং মানব প্রভৃতি নামে খ্যাত জীবাশ্মসমূহ হল এই বর্গের আদি-মানবদের। ক্রম-বিবর্তনের মাধ্যমে হোমো ইরেকটাস মানবদের থেকেই হোমো সেপিয়েন্স (*homo sapiens*) নামে অভিহিত আধুনিক মানব প্রজাতির আবির্ভাব ঘটে আনুমানিক চল্লিশ হাজার থেকে সোয়া লক্ষ বছর আগে। নিয়ানডার্থাল নামে অভিহিত আধুনিক মানব প্রজাতির একটি শাখা বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে অনেকে মনে করেন, এবং তাদের থেকে আলাদা করার জন্য *homo sapiens sapiens* নামের একটি ভিন্ন শাখার অস্তিত্ব ধরে নেওয়া হয়, যেটা বর্তমানে পৃথিবীর বুকে টিকে আছে। তবে দৈহিক নৃবিজ্ঞানীদের কারো কারো মতে নিয়ানডার্থাল ধারার মানুষরা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি, বরং তারা মানব প্রজাতির অন্য শাখার সাথে মিশে বর্তমান যুগের মানুষদের উদ্ভবে ভূমিকা রেখেছে। যাই হোক, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বর্তমান যুগের সকল মানুষই একটি একক প্রজাতির অন্তর্গত, এবং সে হিসাবে সকল মানুষের রয়েছে কিছু অভিন্ন বৈশিষ্ট্য, যেগুলির উপর দৈহিক নৃবিজ্ঞান আলোকপাত করে।

একটি প্রজাতি হিসাবে মানুষের বিশিষ্টতা বুঝতে গিয়ে দৈহিক নৃবিজ্ঞানীদের অনেকে জীববৈজ্ঞানিক বিচারে মানুষের নিকটতম সমকালীন প্রজাতিদের নিয়েও গবেষণা করেন।

একটি প্রজাতি হিসাবে মানুষের বিশিষ্টতা বুঝতে গিয়ে দৈহিক নৃবিজ্ঞানীদের অনেকে জীববৈজ্ঞানিক বিচারে মানুষের নিকটতম সমকালীন প্রজাতিদের নিয়েও গবেষণা করেন। প্রাণীবিজ্ঞানীদের শ্রেণীকরণ অনুসারে মানুষ 'প্রাইমেট' বর্গভুক্ত একটি প্রাণী, যে বর্গের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রজাতির বানর, ape বা 'বনমানুষ' (অর্থাৎ লেজবিহীন বানর, যথা: শিম্পাজী, গরিলা, ওরাঙ উটান, ও গিবন বা উল্লুক, যেগুলো প্রাণীজগতে মানুষের নিকটতম আত্মীয়) এবং লেমুর, ট্রি শ্রু ইত্যাদি আরো কিছু প্রাণী। অন্যান্য প্রাইমেটদের সাথে মানুষের দৈহিক ও শারীরবৃত্তীয় সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যসমূহের তুলনামূলক অধ্যয়ন করা হয় প্রাণী হিসাবে মানুষের বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের লক্ষ্যে। সেসাথে বানর ও 'বনমানুষ'দের সামাজিক আচরণ অধ্যয়নের মাধ্যমেও বোঝার চেষ্টা করা হয় প্রাগৈতাসিক মানুষের সামাজিক সংগঠন কেমন হয়ে থাকতে পারে, এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মানব আচরণ এই সব প্রাণীদের সাথে তুলনীয় বা তাদের থেকে পৃথক।

সাম্প্রতিককালের দৈহিক নৃবিজ্ঞানীদের অধিকাংশই নরগোষ্ঠীর ধারণাকে বিজ্ঞান-সম্মত নয় বলে বাতিল করে দিয়েছেন।

দৈহিক নৃবিজ্ঞানে সমকালীন বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যেকার দৈহিক পার্থক্য ও সম্পর্ক নিয়েও গবেষণা করা হয়। এ ধরনের গবেষণায় দীর্ঘকাল যাবত বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহের উপরই নজর কেন্দ্রীভূত ছিল। গায়ের রং, চুলের ধরন, চোখ-মুখের গড়ন প্রভৃতির ভিত্তিতে মানবজাতিকে বিভিন্ন race বা নরবর্ণে বিভক্ত করার রেওয়াজ ছিল (race-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'মহাজাতি' শব্দটিও বাংলায় প্রচলিত রয়েছে, বিশেষ করে রুশ ভাষা থেকে বাংলায় অনূদিত মিখাইল নেস্তুর্খের *প্রজাতি, জাতি ও প্রগতি* শীর্ষক একটি গ্রন্থে, যা বাংলাদেশের সাধারণ পাঠকদের জন্য সহজলভ্য ছিল)। আপনারা মঙ্গোলীয়, ককেশীয়, নিগ্রোয়েড প্রভৃতি শব্দের সাথে নিশ্চয় পরিচিত আছেন, এবং কোন্ নরবর্ণভুক্ত মানুষের চেহারা বা অন্যান্য দৈহিক বৈশিষ্ট্য কেমন, এ সম্পর্কে আপনাদের কিছু ধারণা হয়তবা আছে। এগুলি হল একটি বহুল-প্রচলিত শ্রেণীকরণ অনুসারে প্রধান কয়েকটি নরবর্ণর নাম। এই শ্রেণীকরণে অনেকসময় অস্ট্রালয়েড নামে আরেকটি প্রধান নরবর্ণকে শনাক্ত করা হয়, অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীরা যেটার অন্তর্গত। তবে প্রকৃতপক্ষে নরবর্ণর সংজ্ঞা ও শ্রেণীকরণ নিয়ে দৈহিক নৃবিজ্ঞানে কখনো কোন সর্বজনস্বীকৃত মতামত ছিল না। অধিকন্তু সাম্প্রতিককালের দৈহিক নৃবিজ্ঞানীদের অধিকাংশই নরবর্ণর ধারণাকে বিজ্ঞান-সম্মত নয় বলে বাতিল করে দিয়েছেন।

যেভাবেই নরবর্ণর সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিন্যাস নির্ধারণ করা হোক না কেন, অনেক জনগোষ্ঠীর দেখা মিলবে যাদের মধ্যে একাধিক নরবর্ণর বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন মাত্রায় ছড়িয়ে আছে। এসব জনগোষ্ঠীকে 'মিশ্র' বলে চিহ্নিত করা হলেও প্রশ্ন থেকে যায়, কারণ মানব ইতিহাসে কখনো পৃথক পৃথক বিশুদ্ধ নরবর্ণ ছিল, এমন কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

সমকালীন দৈহিক নৃবিজ্ঞানে নরবর্ণর ধারণা কার্যত পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়ার একটা প্রধান কারণ হল, যেভাবেই নরবর্ণর সংজ্ঞা ও শ্রেণীকরণ দাঁড় করানো হোক না কেন, বাস্তবে এক নরবর্ণর সাথে আরেক

নরবর্ণর কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা চিহ্নিত করা যায় না। এমন কোন মানবগোষ্ঠী খুঁজে পাওয়া মুশকিল যার প্রত্যেক সদস্যের মধ্যেই সকল ক্ষেত্রে অভিন্ন দৈহিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বরং, যেভাবেই নরবর্ণর সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিন্যাস নির্ধারণ করা হোক না কেন, অনেক জনগোষ্ঠীর দেখা মিলবে যাদের মধ্যে একাধিক নরবর্ণর বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন মাত্রায় ছড়িয়ে আছে। এসব জনগোষ্ঠীকে 'মিশ্র' বলে চিহ্নিত করা হলেও প্রশ্ন থেকে যায়, কারণ মানব ইতিহাসে কখনো পৃথক পৃথক বিশুদ্ধ নরবর্ণ ছিল, এমন কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। নরবর্ণর ধারণা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এসব পদ্ধতিগত সমস্যার পাশাপাশি আরেকটি বিপজ্জনক প্রবণতাও দেখা গেছে, সেটা হল, বিগত শতাব্দীগুলোতে পশ্চিমা অনেক দেশেই নরবর্ণর ধারণার সাথে বর্ণবাদী চিন্তাচেতনা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল, যেখানে বিভিন্ন বাহ্যিক দৈহিক বৈশিষ্ট্যের তারতম্যের ভিত্তিতে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব বা নিকৃষ্টতার ধারণা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হত। এ ধরনের চিন্তাধারার পরিণতি কত মারাত্মক হতে পারে, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল হিটলারের নাৎসী বাহিনী যখন জার্মান জাতিকে 'শুদ্ধ' করার নামে লক্ষ লক্ষ ইহুদী ও জিপসীকে হত্যা করে।

বর্তমানে দৈহিক নৃবিজ্ঞানে বাহ্যিক দৈহিক বৈশিষ্ট্যের চাইতে মানবজাতির অন্তর্নিহিত জেনেটিক (genetic অর্থাৎ জিন-সংক্রান্ত) বৈচিত্র্য অধ্যয়নের উপর অধিকতর জোর দেওয়া হয়। পৃথিবীতে বর্তমানে বসবাসরত জনগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে বিভিন্ন জেনেটিক বৈশিষ্ট্য কিভাবে বন্টিত, এবং জেনেটিক পার্থক্যগুলো কি কারণে বা কি প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত হয়ে থাকতে পারে, এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার কাজে অনেক দৈহিক নৃবিজ্ঞানীও শামিল রয়েছেন। আর এ ধরনের পরিবর্তনের আলোকে ইদানীং দৈহিক নৃবিজ্ঞানের স্থলে জৈবিক নৃবিজ্ঞান (biological anthropology) পরিচয়টাই অনেকের কাছে অধিকতর গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে। যাই হোক, মানব বৈচিত্র্যের জৈবিক উপাদানসমূহ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে দৈহিক/জৈবিক নৃবিজ্ঞানীদের নজর বাহ্যিক বা অবাহ্যিক যে ধরনের পার্থক্যের উপরই কেন্দ্রীভূত হোক না কেন, এসব পার্থক্যের মধ্য দিয়েও একই প্রজাতির সদস্য হিসাবে পৃথিবীর সকল মানুষ যেসব অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সেগুলির উপর আলোকপাত করাও তাঁদের অন্যতম লক্ষ্য থাকে। এভাবে তাঁরা মানব অস্তিত্বকে পূর্ণাঙ্গভাবে অনুধাবনে সহায়তা করেন।

বর্তমানে দৈহিক নৃবিজ্ঞানে বাহ্যিক দৈহিক বৈশিষ্ট্যের চাইতে মানবজাতির অন্তর্নিহিত জেনেটিক বৈচিত্র্য অধ্যয়নের উপর অধিকতর জোর দেওয়া হয়।

সারাংশ

দৈহিক নৃবিজ্ঞানে যেসব বিষয় অধ্যয়ন করা হয় সেগুলির মধ্যে রয়েছে একটি প্রজাতি হিসাবে মানুষের উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস, জৈবিক বৈশিষ্ট্যের বিচারে মানুষের নিকটতম প্রাণীদের সাথে মানুষের মিল ও অমিল, এবং দৈহিক ও অন্যান্য জৈবিক বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে মানবজাতির মধ্যেকার বৈচিত্র্য। দৈহিক নৃবিজ্ঞানে সমকালীন বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যেকার দৈহিক পার্থক্য ও সম্পর্ক নিয়েও গবেষণা করা হয়। এ ধরনের গবেষণায় দীর্ঘকাল যাবত বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহের উপরই নজর কেন্দ্রীভূত ছিল। গায়ের রং, চুলের ধরন, চোখ-মুখের গড়ন প্রভৃতির ভিত্তিতে মানবজাতিকে বিভিন্ন race বা নরবর্ণে বিভক্ত করার রেওয়াজ ছিল। প্রকৃতপক্ষে নরবর্ণর সংজ্ঞা ও শ্রেণীকরণ নিয়ে দৈহিক নৃবিজ্ঞানে কখনো কোন সর্বজনস্বীকৃত মতামত ছিল না। অধিকন্তু সাম্প্রতিককালের দৈহিক নৃবিজ্ঞানীদের অধিকাংশই নরবর্ণর ধারণাকে বিজ্ঞান-সম্মত নয় বলে বাতিল করে দিয়েছেন। সমকালীন দৈহিক নৃবিজ্ঞানে নরবর্ণর ধারণা কার্যত পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়ার একটা প্রধান কারণ হল, যেভাবেই নরবর্ণর সংজ্ঞা ও শ্রেণীকরণ দাঁড় করানো হোক না কেন, বাস্তবে এক নরবর্ণর সাথে আরেক নরবর্ণর কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা চিহ্নিত করা যায় না। বর্তমানে দৈহিক নৃবিজ্ঞানে বাহ্যিক দৈহিক বৈশিষ্ট্যের চাইতে মানবজাতির অন্তর্নিহিত জেনেটিক (genetic অর্থাৎ জিন-সংক্রান্ত) বৈচিত্র্য অধ্যয়নের উপর অধিকতর জোর দেওয়া হয়। এ ধরনের পরিবর্তনের আলোকে ইদানীং

দৈহিক নৃবিজ্ঞানের স্থলে জৈবিক নৃবিজ্ঞান (biological anthropology) পরিচয়টাই অনেকের কাছে অধিকতর গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন -

১। জীবাশ্ম হল
- ক. ভস্মীভূত জীবদেহ
- খ. মাটির নীচে প্রস্তরীভূত অবস্থায় থাকা জীবজন্তুর কংকাল, গাছ-পালা ইত্যাদি
- গ. এমন কোন শিলাখন্ড, যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে
- ঘ. লক্ষ-কোটি বছরের পুরানো কোন বস্তু

২। অস্ট্রালোপিথেকাস বলতে বোঝায়
- ক. উল্লুকের মত দেখতে এক শ্রেণীর বানরকে
- খ. খাড়া হয়ে হাঁটতে চলতে পারত, অতীতের এমন সকল প্রাণীকে
- গ. মানুষের সাথে সম্পর্কিত বলে বিবেচিত বহু লক্ষ বছর আগেকার বিলুপ্ত কিছু প্রজাতিকে
- ঘ. অস্ট্রেলিয়ার প্রাগৈতিহাসিক মানুষদের

৩। প্রাইমেট বলতে বোঝায়
- ক. লেজবিশিষ্ট বানরদের
- খ. মানুষসহ শিম্পাঞ্জী, গরিলা, ওরাংউটান, গিবন ও বিভিন্ন প্রজাতির বানরদের
- গ. লেজবিহীন বানরদের
- ঘ. মানুষ ছাড়া মানুষের মত দেখতে অন্যান্য প্রাণীদের

৪। নিয়ানডার্থালদের সম্পর্কে কোন্ ধারণাটি ভ্রান্ত?
- ক. তাদের সাথে আধুনিক মানুষদের কিছু পার্থক্য রয়েছে
- খ. তাদের সাথে আধুনিক মানুষদের বিরাট কোন পার্থক্য নেই
- গ. তাদের সাথে আধুনিক মানুষদের যত মিল, তার চাইতে বেশী মিল শিম্পাঞ্জী গরিলাদের সাথে
- ঘ. তারা হয়তবা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায়নি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। নরবর্ণ কি?

২। সমকালীন দৈহিক নৃবিজ্ঞানে নরবর্ণের ধরনা কার্যত পরিত্যক্ত হওয়ার প্রধান কারণ কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। দৈহিক নৃবিজ্ঞানে কী ধরনের বিষয় অধ্যয়ন করা হয়, এবং কীভাবে, আলোচনা করুন।

২। দৈহিক নৃবিজ্ঞানের আলোকে মানব বিবর্তনের একটি রূপরেখা তুলো ধরুন।

৩। নরবর্ণ বলতে কী বোঝায়? সমকালীন প্রেক্ষাপটে এই ধারণার উপযোগিতা আলোচনা করুন।

পাঠ - ৩

সামাজিক/সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান
Social/Cultural Anthropology

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- সামজিক নৃবিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের পার্থক্য ও আন্তঃসম্পর্ক
- সামাজিক/সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের অধ্যয়নের বিষয়সমূহ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা
- নৃবিজ্ঞানে 'সমাজ' ও 'সংস্কৃতি' ধারণার তাৎপর্য

সামাজিক নৃবিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান হচ্ছে নৃবিজ্ঞান চর্চার যথাক্রমে ব্রিটিশ ও মার্কিন ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত দুটি ঘনিষ্ঠ ধারা। নামকরণের পার্থক্য সত্ত্বেও শুরু থেকেই সামাজিক নৃবিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের মধ্যে সুস্পষ্ট কোন সীমারেখা ছিল না।

সামাজিক নৃবিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান হচ্ছে নৃবিজ্ঞান চর্চার যথাক্রমে ব্রিটিশ ও মার্কিন ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত দুটি ঘনিষ্ঠ ধারা। নামকরণের পার্থক্য সত্ত্বেও শুরু থেকেই সামাজিক নৃবিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের মধ্যে সুস্পষ্ট কোন সীমারেখা ছিল না। (আপনারা যদি বাজারে প্রচলিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের একাধিক পাঠ্যবই মিলিয়ে দেখেন, তাহলে লক্ষ্য করবেন যে, কোন পাঠ্য বইয়ের শিরোনামে হয়ত শুধু সামাজিক নৃবিজ্ঞান, এবং আরেকটাতে হয়ত শুধু সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান রয়েছে, কিন্তু সূচীপত্রে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর তালিকা কমবেশী একইরকমই পাবেন।) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক, উভয় ধারার নৃবিজ্ঞানেরই সূচনা হয়েছিল সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপত্তি সম্পর্কে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত বিভিন্ন অনুমাননির্ভর তত্ত্বের বিরোধিতা করে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহের উপর জোর দেওয়ার মাধ্যমে। সামাজিক নৃবিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে যথাক্রমে 'সমাজ' ও 'সংস্কৃতি' প্রত্যয়ের উপর প্রাধান্য দেওয়া হলেও উভয় ধারার নৃবিজ্ঞানীরাই এই বিষয়গুলি অধ্যয়নের জন্য তথাকথিত আদিম জনগোষ্ঠীদের উপরই বেশী নজর দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, 'আদিম' বলে বিবেচিত বিভিন্ন সমাজ ও তাদের সংস্কৃতির তুলনামূলক অধ্যয়নই একটা সময় পর্যন্ত সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের মূল পরিচায়ক ছিল। উভয় ধারার নৃবিজ্ঞানেই বিভিন্ন আদিম সমাজের জ্ঞাতিব্যবস্থা, রাজনৈতিক সংগঠন, ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার, প্রভৃতি বিষয় নিয়ে গবেষণা হয়েছে। এসব কারণে, যেমনটা ইতোমধ্যে আপনারা জেনেছেন, মার্কিন ধারার সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান ও ব্রিটিশ ধারার সামাজিক নৃবিজ্ঞানকে একই বৃহত্তর ধারার অন্তর্গত হিসাবে গণ্য করা হয়, যাকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান হিসাবে অনেকেই অভিহিত করে থাকেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সংস্কৃতির সংজ্ঞায়ন ও এই ধারণার উপর গুরুত্বারোপের ক্ষেত্রে মার্কিন নৃবিজ্ঞানীরা অনেকটা ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী টায়লরের ঐতিহ্য অনুসরণ করেছেন, (টায়লরের দেওয়া সংস্কৃতির সংজ্ঞা আগেই উদ্ধৃত করা হয়েছে পাঠ ১-এ)। অন্যদিকে জ্ঞাতিসম্পর্কের মত বিষয় অধ্যয়নের উপর নজর দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সামাজিক নৃবিজ্ঞানীরা অনেকটা মার্কিন নৃবিজ্ঞানী মর্গানের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রিটেনে যারা সামাজিক নৃবিজ্ঞানী হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতে শুরু করেছিলেন, তারা মনে করতেন যে তাদের অধ্যয়নের মূল বিষয় ছিল 'সমাজ', বিশেষ করে 'আদিম সমাজ'।

সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান
পরিচিতি *পৃষ্ঠা-১১*

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রিটেনে যারা সামাজিক নৃবিজ্ঞানী হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতে শুরু করেছিলেন, তারা মনে করতেন যে তাদের অধ্যয়নের মূল বিষয় ছিল 'সমাজ', বিশেষ করে 'আদিম সমাজ'। উল্লেখ্য, সমাজ অধ্যয়নের জন্য সমাজবিজ্ঞান (sociology) নামে একটি জ্ঞানকান্ড ততদিনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ মাত্রই যে কোন না কোন সমাজের সদস্য, এই সত্যটা উপলব্ধি করার জন্য আমাদের সমাজ বিজ্ঞান পড়ার দরকার পড়ে না। আপনার আমার প্রত্যেকেরই নিজ নিজ সমাজ সম্পর্কে এক ধরনের জ্ঞান আছে, যা আমরা সমাজের সদস্য হিসাবে অর্জন করি। তবে সচরাচর আমরা নিজ নিজ অভিজ্ঞতার বাইরে 'সমাজ' ধারণা নিয়ে বিমূর্তভাবে ভাবি না, বা পুরো সমাজ ব্যবস্থা কিভাবে সংগঠিত, এটির বিভিন্ন অংশ কি কি এবং সেগুলি কীভাবে কাজ করে, কখন বা কেন সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে, এ ধরনের প্রশ্ন নিয়ে সচেতনভাবে ভাবি না। এ কাজটাই করার চেষ্টা করেছেন সমাজবিজ্ঞানীরা। জ্ঞানচর্চার একটি পৃথক শাখা হিসাবে সমাজবিজ্ঞানের অস্তিত্ব সবসময় ছিল না। এটির জন্ম হয়েছিল ইউরোপে, যখন শিল্পায়নসহ বিভিন্ন আনুষাঙ্গিক আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে ইউরোপীয় সমাজসমূহ দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল। পথিকৃৎ সমাজবিজ্ঞানীদের অনেকে মনে করতেন যে, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমে যেভাবে অণু-পরমাণু থেকে শুরু করে বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড ও জীবজগত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়েছে, তেমনি সমাজকে বস্তুনিষ্ঠভাবে জানা সম্ভব। সেজন্য চাই যথাযথভাবে নিরূপিত প্রত্যয়, তত্ত্ব ও গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগ। এভাবে পরিবর্তনশীল ইউরোপীয় সমাজসমূহকে ভাল করে জানা ও বোঝার তাগিদ থেকে জন্ম হয়েছিল সমাজবিজ্ঞানের। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের পথিকৃৎদের অন্যতম ছিলেন ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী ডুর্খাইম, যাঁর চিন্তাভাবনা সরাসরি প্রভাবিত করেছিল ব্রিটিশ সামাজিক নৃবিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনকে। ফলে অনেক দিক থেকে ব্রিটিশ ধারার সামাজিক নৃবিজ্ঞান গড়ে উঠেছিল সমাজবিজ্ঞানের আদলেই। দু'য়ের মধ্যে মূল পার্থক্য যা ছিল তা হল, যেখানে সমাজবিজ্ঞানীদের নজর ছিল শিল্পায়িত সমাজগুলোর প্রতি, সেখানে সামাজিক নৃবিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণাক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন ইউরোপের উপনিবেশগুলোতে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত সরল বা আদিম বলে বিবেচিত সমাজগুলোকে। নৃবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে এ ধরনের সমাজে [illegible] সামাজিক সংগঠনের প্রধান ভিত্তি। ফলে সামাজিক নৃবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সমাজের [illegible]র উপর বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা দেখার চেষ্টা করেছেন, বংশধারা [illegible]বাহ ব্যবস্থা প্রভৃতি কিভাবে উৎপাদন, বন্টন, ক্ষমতা, মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ের সাথে

ব্রিটিশ ধারার সামাজিক নৃবিজ্ঞান গড়ে উঠেছিল সমাজবিজ্ঞানের আদলেই। দু'য়ের মধ্যে মূল পার্থক্য যা ছিল তা হল, যেখানে সমাজবিজ্ঞানীদের নজর ছিল শিল্পায়িত সমাজগুলোর প্রতি, সেখানে সামাজিক নৃবিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণাক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন ইউরোপের উপনিবেশগুলোতে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত সরল বা আদিম বলে বিবেচিত সমাজগুলোকে।

[illegible]স্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের সূচনাকালেও গবেষকদের দৃষ্টি ছিল প্রযুক্তি বা সামাজিক [illegible]রে অপেক্ষাকৃত 'আদিম' বলে বিবেচিত সেদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের প্রতি। [illegible] তাঁরা 'সংস্কৃতি'র ধারণাকে কেন্দ্র করে তাঁদের গবেষণা ও লেখালেখি সংগঠিত করেছিলেন। বলা বাহুল্য, প্রচলিত অর্থে সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায়, তার থেকে ভিন্ন বা ব্যাপকতর অর্থে নৃবিজ্ঞানীরা শব্দটিকে ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, প্রচলিত ব্যবহারে সংস্কৃতি শব্দটি নৃত্য-গীত জাতীয় বিষয়কেই নির্দেশ করে। আমরা যখন কোন 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান'-এর কথা বলি, অথবা যখন কোন ব্যক্তি বা পরিবারকে 'সংস্কৃতিমনা' হিসাবে চিহ্নিত করি, তখন শব্দটিকে এ ধরনের একটি বিশেষ অর্থেই ব্যবহার করি। ইংরেজীসহ ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায়ও সংস্কৃতির সমার্থক শব্দসমূহ শুরুতে মূলতঃ এরকম প্রচলিত অর্থেই ব্যবহৃত হত, ফলে সমাজের বিভিন্ন অংশকে তথা বিভিন্ন সমাজকে সাংস্কৃতিক মানদন্ডে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট হিসাবে দেখার প্রবণতা ছিল। বিশেষ করে ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়া ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত শ্বেতাঙ্গ মানুষদের চোখে উপনিবেশসমূহের আদিম অধিবাসীদের সংস্কৃতি ছিল খুবই নিম্নমানের। সাধারণভাবে প্রত্যেক মানুষের কাছে তার নিজের সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি আচার-প্রথা ইত্যাদি--অর্থাৎ এক কথায় তার নিজের সংস্কৃতি--স্বাভাবিক বলে মনে হয়, এবং ভিন্ন কোন সংস্কৃতির মুখোমুখি হলে সেটার অনেক কিছুকে অস্বাভাবিক বা অদ্ভুত বলে মনে হতে পারে। এই প্রবণতাকে নৃবিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন স্বজাতিকেন্দ্রিকতা (ethnocentrism)। মানুষ হিসাবে একজন নৃবিজ্ঞানীর মধ্যেও স্বজাতিকেন্দ্রিক প্রবণতা থাকতে পারে, যা ভিন্ন একটি সংস্কৃতিকে জানতে বুঝতে গেলে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে, বিশেষ করে তা যদি হয়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের সূচনাকালেও গবেষকদের দৃষ্টি ছিল প্রযুক্তি বা সামাজিক সংগঠনের ধরন অনুসারে অপেক্ষাকৃত 'আদিম' বলে বিবেচিত সেদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের প্রতি। পার্থক্য ছিল এই যে, তাঁরা 'সংস্কৃতি'র ধারণাকে কেন্দ্র করে তাঁদের গবেষণা ও লেখালেখি সংগঠিত করেছিলেন।

আদিম বলে বিবেচিত কোন জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি। এই প্রেক্ষিতে আধুনিক মার্কিন নৃবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা ফ্রাঞ্জ বোয়াস ও তার অনুসারীরা 'সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদ' (cultural relativism) নামে পরিচিত হয়ে ওঠা একটি দৃষ্টিভঙ্গীর উপর জোর দিয়েছিলেন, যেটার মোদ্দা কথা হল কোন ভিন্ন সংস্কৃতিকে অধ্যয়ন করতে হলে ঐ সংস্কৃতির ধারক বাহকদের দৃষ্টিকোণ থেকেই সেটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানার এবং ভাল করে বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

ব্রিটিশ ধারার সামাজিক নৃবিজ্ঞান ও মার্কিন ধারার সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে 'সমাজ' ও 'সংস্কৃতি' ধারণার আপেক্ষিক গুরুত্ব নিরূপণের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য থেকে থাকতে পারে, কিন্তু কোন ধারাতেই একটি ধারণাকে বাদ দিয়ে শুধু অন্যটির উপর জোর দেওয়া হয় নি। (মানুষ সংস্কৃতি শেখে সমাজের সদস্য হিসাবে, কাজেই সমাজের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে সংস্কৃতির কথা বলা অর্থহীন। আবার সংস্কৃতির ধারণা বাদ দিলে মানব সমাজের বৈশিষ্ট্য বোঝা সম্ভব না, কারণ মানুষ ছাড়াও সমাজবদ্ধ প্রাণী আরো রয়েছে, কিন্তু একমাত্র মানবসমাজের ক্ষেত্রেই সংস্কৃতির ধারণা প্রযোজ্য।) উভয় ধারাতেই মূলতঃ আদিম বলে বিবেচিত জনগোষ্ঠীদের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। একদিকে শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের চাপের মুখে আদিবাসী আমেরিকানরা বিলুপ্ত বা আমূল পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার আগেই সেসব জনগোষ্ঠী ও তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে যতটা সম্ভব বিস্তারিত ও নিখুঁত দলিল তৈরী করার ব্যাপারে মার্কিন নৃবিজ্ঞানীরা বিশেষ তাগিদ বোধ করেছিলেন। একইভাবে ব্রিটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের নৃবিজ্ঞানীরাও মনোযোগী ছিলেন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যসমূহের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত 'আদিম' জনগোষ্ঠীদের সম্পর্কে বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করার ব্যাপারে। এভাবে আটলান্টিকের উভয় পারের নৃবিজ্ঞান চর্চায় প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথাকথিত আদিম জনগোষ্ঠীদের সার্বিক জীবন যাত্রার ধরন, তাদের সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনৈতিক সংগঠন, ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করার একটা ঐতিহ্য তৈরী হয়। এভাবে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বিভিন্ন সমাজ বা সংস্কৃতি সম্পর্কে আলাদা আলাদা বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে সামষ্টিকভাবে, বা এ প্রক্রিয়ায় রচিত কোন গ্রন্থকে, নৃবিজ্ঞানে এথনোগ্রাফি বলা হয় (ethnography: এই শব্দের প্রথম উপাদান, *ethno-*, গ্রীক ভাষা থেকে উদ্ভূত, যার বাংলা অর্থ করা যেতে পারে 'জাতি' বা 'জনগোষ্ঠী'; *-graphy* বলতে বোঝায় লিখার প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি)। এখনো সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীদের কর্মকান্ডের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে এথনোগ্রাফি রচনা করা, যদিও সমকালীন এথনোগ্রাফিগুলো আগের মত শুধুই তথাকথিত আদিম সমাজগুলোকে ঘিরে তৈরী করা হয় না।

ব্রিটিশ ধারার সামাজিক নৃবিজ্ঞান ও মার্কিন ধারার সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে 'সমাজ' ও 'সংস্কৃতি' ধারণার আপেক্ষিক গুরুত্ব নিরূপণের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য থেকে থাকতে পারে, কিন্তু কোন ধারাতেই একটি ধারণাকে বাদ দিয়ে শুধু অন্যটির উপর জোর দেওয়া হয় নি।

প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বিভিন্ন সমাজ বা সংস্কৃতি সম্পর্কে আলাদা আলাদা বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে সামষ্টিকভাবে, বা এ প্রক্রিয়ায় রচিত কোন গ্রন্থকে, নৃবিজ্ঞানে এথনোগ্রাফি বলা হয়।

নৃবৈজ্ঞানিক কর্মকান্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসাবে এথনোগ্রাফি-চর্চার প্রসারের পেছনে একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন সমাজের তুলনামূলক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য তথ্যের একটি ভান্ডার গড়ে তোলা। উনবিংশ শতাব্দীতেই এথনোলজি (ethnology) বা জাতিতত্ত্ব নামে পরিচিত নৃবিজ্ঞানের একটি বিশেষায়িত শাখা গড়ে উঠেছিল এ ধরনের তুলনামূলক অধ্যয়নকে ঘিরেই। তবে তখন যে ধরনের তথ্যের উপর ভিত্তি করে জাতিতত্ত্ববিদরা তুলনামূলক বিশ্লেষণের কাজ করতেন - বণিক, ঔপনিবেশিক প্রশাসক, পরিব্রাজক, মিশনারী প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য - সেগুলির নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল। এই প্রেক্ষিতে নূতন প্রজন্মের প্রশিক্ষিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীদের রচিত এথনোগ্রাফিগুলি জাতিতাত্ত্বিক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তথ্যের অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য উৎস হিসাবে বিবেচিত হতে থাকে। সেই সূত্রে এথনোগ্রাফি ও এথনোলজিকে সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের দুইটি পরস্পরসম্পর্কিত ক্ষেত্র বা শাখা হিসাবে অনেকে চিহ্নিত করেছেন, আবার অনেকে এথনোলজি কথাটা কমবেশী সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের সমার্থক হিসাবেই ব্যবহার করেছেন। তবে সময়ের সাথে সাথে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের সমার্থক হিসাবে বা এর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসাবে এথনোলজি

নৃবৈজ্ঞানিক কর্মকান্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসাবে এথনোগ্রাফি-চর্চার প্রসারের পেছনে একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন সমাজের তুলনামূলক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য তথ্যের একটি ভান্ডার গড়ে তোলা।

নামের ব্যবহার প্রায় অপ্রচলিত হয়ে গেছে। এর পরিবর্তে বিষয়-ভিত্তিক বিশেষায়নের মাধ্যমে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান, রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান, ধর্মের নৃবিজ্ঞান ইত্যাদি আলাদা আলাদা ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়
সামাজিক-সাংস্কৃতিক
চর্চার ক্ষেত্রে বেশ কিছু
পরিবর্তন ঘটেছে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলো গুটিয়ে নেওয়া হয়েছিল আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রসারের মুখে। এই প্রেক্ষিতে স্বাধীনতাকামী বা সদ্যস্বাধীন দেশগুলোতে নৃবিজ্ঞানীদের উপস্থিতি প্রশ্নের মুখে পড়তে শুরু করে। এমন অভিযোগ উঠতে থাকে যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের জ্ঞান আসলে ঔপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পক্ষেই কাজ করে। অন্যদিকে, খোদ পশ্চিমা দেশগুলোতেও বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, যেমন ষাট ও সত্তরের দশকে সংখ্যালঘু, নারী ও তরুণদের অধিকারের প্রশ্নে অনেকে সোচ্চার হতে শুরু করে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানীদের মত নৃবিজ্ঞানীরাও অনেকে নিজেদের জ্ঞানচর্চার ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তলিয়ে দেখতে শুরু করেন। এই আত্মসমীক্ষার প্রক্রিয়ায় সব নৃবিজ্ঞানী সমানভাবে শামিল না হলেও ক্রমশঃ এই উপলব্ধি ব্যাপকতা পেতে শুরু করে যে, 'আদিম সমাজ'-কেন্দ্রিক নৃবিজ্ঞান চর্চার দিন ফুরিয়ে গেছে। ফলে পূর্বের ঐতিহ্য থেকে সরে এসে অনেক সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীই গবেষণার নূতন ক্ষেত্র, নূতন বিষয়, নূতন পদ্ধতি ও নূতন তাত্ত্বিক কাঠামোর অনুসন্ধান করেছেন। এই অনুসন্ধানের ফলাফল স্বল্প পরিসরে বর্ণনা করা যাবে না, তবে সংক্ষেপে কিছু প্রবণতার কথা উল্লেখ করা যায়।

পূর্বের ঐতিহ্য থেকে সরে এসে অনেক সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীই গবেষণার নূতন ক্ষেত্র, নূতন বিষয়, নূতন পদ্ধতি ও নূতন তাত্ত্বিক কাঠামোর অনুসন্ধান করেছেন।

সমকালীন সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা কাজ করেন সম্ভাব্য সব ধরনের গবেষণাক্ষেত্রে - সেটা হতে পারে কৃষক অধ্যুষিত কোন গ্রাম, শহরের মধ্যবিত্ত-অধ্যুষিত কোন এলাকা, কোন বাণিজ্যিক কেন্দ্র বা শিল্পাঞ্চল। এগুলো হল বাহ্যিক পরিসরে নৃবিজ্ঞানীদের বিচরণের নূতন ক্ষেত্র। গবেষণার বিষয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে বা তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগতভাবেও সমকালীন নৃবিজ্ঞানীদের বিচরণের পরিধি অনেক বেশী উন্মুক্ত। পরিবারে লিঙ্গীয় অসমতা থেকে শুরু করে বিশ্বায়ন, সব ধরনের বিষয় নিয়ে তাঁরা গবেষণা করেন। তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে কেউ নিজেকে চিহ্নিত করতে পারেন নারীবাদী হিসাবে, পরিবেশবাদী হিসাবে, বা উত্তর-আধুনিকতাবাদী হিসাবে। নৃবিজ্ঞানী পরিচয়ধারী এমন গবেষককেও আপনি খুঁজে পাবেন যিনি 'মাঠে' নয়, ঐতিহাসিক দলিলপত্রের সংগ্রহশালাতেই সময় কাটাচ্ছেন। মোট কথা, সমকালীন প্রেক্ষিতে একজন সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী কোন্ কোন্ দিক থেকে একজন অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বা ইতিহাসবিদের থেকে আলাদা, তা সবক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া যাবে না।

সমকালীন প্রেক্ষিতে একজন সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী কোন্ কোন্ দিক থেকে একজন অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বা ইতিহাসবিদের থেকে আলাদা, তা সবক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া যাবে না।

সারাংশ

সামাজিক নৃবিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান হচ্ছে নৃবিজ্ঞান চর্চার যথাক্রমে ব্রিটিশ ও মার্কিন ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত দুটি ঘনিষ্ঠ ধারা। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক, উভয় ধারার নৃবিজ্ঞানেরই সূচনা হয়েছিল সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপত্তি সম্পর্কে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত বিভিন্ন অনুমাননির্ভর তত্ত্বের বিরোধিতা করে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহের উপর জোর দেওয়ার মাধ্যমে। সামাজিক নৃবিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে যথাক্রমে 'সমাজ' ও 'সংস্কৃতি' প্রত্যয়ের উপর প্রাধান্য দেওয়া হলেও উভয় ধারার নৃবিজ্ঞানীরাই এই বিষয়গুলি অধ্যয়নের জন্য তথাকথিত আদিম জনগোষ্ঠীদের উপরই বেশী নজর দিয়েছিলেন। মার্কিন ধারার সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান ও ব্রিটিশ ধারার সামাজিক নৃবিজ্ঞানকে একই বৃহত্তর ধারার অন্তর্গত হিসাবে গণ্য করা হয়, যাকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান হিসাবে অনেকেই অভিহিত করে থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের সূচনাকালেও গবেষকদের দৃষ্টি ছিল প্রযুক্তি বা সামাজিক সংগঠনের ধরন অনুসারে অপেক্ষাকৃত 'আদিম' বলে বিবেচিত সেদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের প্রতি।ব্রিটিশ ধারার সামাজিক নৃবিজ্ঞান ও মার্কিন ধারার সাংস্কৃতিক

নৃবিজ্ঞানে 'সমাজ' ও 'সংস্কৃতি' ধারণার আপেক্ষিক গুরুত্ব নিরূপণের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য থেকে থাকতে পারে, কিন্তু কোন ধারাতেই একটি ধারণাকে বাদ দিয়ে শুধু অন্যটির উপর জোর দেওয়া হয় নি। উভয় ধারাতেই মূলতঃ আদিম বলে বিবেচিত জনগোষ্ঠীদের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সমকালীন সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা কাজ করেন সম্ভাব্য সব ধরনের গবেষণাক্ষেত্রে - সেটা হতে পারে কৃষক অধ্যুষিত কোন গ্রাম, শহরের মধ্যবিত্ত-অধ্যুষিত কোন এলাকা, কোন বাণিজ্যিক কেন্দ্র বা শিল্পাঞ্চল। গবেষণার বিষয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে বা তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগতভাবেও সমকালীন নৃবিজ্ঞানীদের বিচরণের পরিধি অনেক বেশী উন্মুক্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন -

১। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান ও সামাজিক নৃবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কি?
- ক. কোন পার্থক্য নেই
- খ. প্রথমটি মূলত আমেরিকায়, এবং দ্বিতীয়টি মুলত ব্রিটেনে প্রচলিত নাম
- গ. প্রথমটিতে সংস্কৃতি ধারণার উপর, এবং দ্বিতীয়টিতে সমাজ ধারণার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়
- ঘ. খ ও গ উভয়ই প্রযোজ্য

২। ব্রিটেনে সামাজিক নৃবিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন-
- ক. মর্গান
- খ. টাইলর
- গ. র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন
- ঘ. ডুর্খাইম

৩। আধূনিক মার্কিন নৃবিজ্ঞানের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন:
- ক. মর্গান
- খ. টাইলর
- গ. বোয়াস
- ঘ. র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন

৪। এথনোগ্রাফি বলতে বোঝায়,
- ক. সংস্কৃতির বিবর্তনের ইতিহাস
- খ. আদিম সমাজসমূহ সম্পর্কে পাওয়া বিভিন্ন তথ্য
- গ. কোন নির্দিষ্ট সমাজের সংস্কৃতির বিবরণ বা এরকম বিবরণ তৈরীর সামগ্রিক প্রক্রিয়া
- ঘ. বিভিন্ন সমাজের সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের তুলনামূলক অধ্যয়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। স্বজাতিকেন্দ্রিকতা (ethnocentrism) কী?

২। এথনোলজি (ethnology) কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। 'শুরু থেকেই সামাজিক নৃবিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের মধ্যে সুস্পষ্ট কোন সীমারেখা ছিল না'- ব্যাখ্যা করুন।

২। এথনোগ্রাফি কী? কি ধরনের এথনোগ্রাফি চর্চার প্রতি সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা মনোযোগী ছিলেন এবং কেন?

৩। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান চর্চায় কি ধরনের পরিবর্তন এসেছে আলোচনা করুন।

পাঠ - ৪

প্রত্নতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব
Archaeology and Linguistics

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- প্রত্নতত্ত্ব কি ধরনের বিজ্ঞান
- নৃবিজ্ঞানে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব
- একটি বিজ্ঞান হিসাবে ভাষাতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয়
- নৃবিজ্ঞানের আওতায় ভাষাতত্ত্ব চর্চার উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট

প্রত্নতত্ত্ব

প্রত্নতত্ত্ব হচ্ছে সেই বিজ্ঞান, যা অতীতকালের মানুষদের রেখে যাওয়া বিভিন্ন বস্তু-সামগ্রীর ধ্বংসাবশেষ সুনিপূণ খননকার্যের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করে সেগুলোর ভিত্তিতে তাদের সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতি প্রভৃতির রূপরেখা পুনর্নির্মাণ করে।

বাংলাদেশের কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে আপনি হয়ত পাহাড়পুর বা ময়নামতির বৌদ্ধবিহার সম্পর্কে বলবেন। অথবা কখনো যদি ঢাকার জাতীয় জাদুঘরে গিয়ে থাকেন, সেখানে রক্ষিত কোন নিদর্শন সম্পর্কে বলবেন। অর্থাৎ প্রত্নতত্ত্ব (archaeology) কি, এ সম্পর্কে কিছু পূর্বধারণা আপনার অবশ্যই আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বলতে বোঝায় অতীতের মানুষদের ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী ও ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ যেগুলো কালের প্রবাহে মাটির নীচে চাপা পড়ে যাওয়া অবস্থা থেকে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব হচ্ছে সেই বিজ্ঞান, যা অতীতকালের মানুষদের রেখে যাওয়া বিভিন্ন বস্তু-সামগ্রীর ধ্বংসাবশেষ সুনিপূণ খননকার্যের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করে সেগুলোর ভিত্তিতে তাদের সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতি প্রভৃতির রূপরেখা পুনর্নির্মাণ করে। বিশ্বের অনেক দেশেই প্রত্নতত্ত্ব একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানকান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও অনেক জায়গায় আবার নৃবিজ্ঞানের একটি শাখা হিসাবেও এর চর্চা রয়েছে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। নৃবিজ্ঞানের একটি শাখা হিসাবে যখন এর চর্চা হয়, তখন তাকে প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান বা নৃবৈজ্ঞানিক প্রত্নতত্ত্ব বলা হয় (অর্থের বিশেষ কোন তারতম্য ছাড়াই উভয় নামকরণই নৃবিজ্ঞানে প্রচলিত)।

আদিকালের মানুষেরা কবে কোথায় কি ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করত, তাদের খাদ্যাভ্যাস কি ধরনের ছিল, কোথায় কবে মানুষ কুকুর-ঘোড়া-গরু ইত্যাদি পালতে বা চাষাবাদ করতে শুরু করে, ইত্যাদি বিষয়ে আমরা যা জানি, সবই প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানীদের অবদান।

প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানকে প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বও (prehistoric archaeology) বলা হয়, কারণ এর অধ্যয়নের বিষয় সচরাচর সুদূর অতীতের এমন সব মানব সমাজ যারা নিজেদের সম্পর্কে কোন লিখিত দলিল রেখে যায় নি (মানব ইতিহাসে লিপির ব্যবহার অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক; সময়ের পথে পেছনে যেতে থাকলে যেখানে ইতিহাসের কোন লিপিবদ্ধ সূত্র আর পাওয়া যায় না, সেখান থেকে শুরু প্রাক-ইতিহাস)। প্রস্তর যুগ, লৌহ যুগ ইত্যাদি কথা আপনারা নিশ্চয় অনেক আগে স্কুল পাঠ্য বইয়ে পড়েছেন। এগুলি হল

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা অনেকক্ষেত্রেই দলীয় গবেষণা

প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানীদের দেওয়া নাম। আপনারা নিশ্চয় একথাও আগেই পড়েছেন যে হাজার হাজার বছর আগে পৃথিবীর কোথাও মানুষ চাষাবাদ করত না, তারা পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করে পশু শিকার করত, ইত্যাদি। আদিকালের মানুষেরা কবে কোথায় কি ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করত, তাদের খাদ্যাভ্যাস কি ধরনের ছিল, কোথায় কবে মানুষ কুকুর-ঘোড়া-গরু ইত্যাদি পালতে বা চাষাবাদ করতে শুরু করে, ইত্যাদি বিষয়ে আমরা যা জানি, সবই প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানীদের অবদান। এ প্রসঙ্গে আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানীরা কিসের ভিত্তিতে এতসব বিষয় জানেন?

প্রত্নতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য একজন নৃবিজ্ঞানীকে একাধারে ভূতত্ত্ব, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে হয়। সেটা সবক্ষেত্রে সম্ভব হয় না বলে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা অনেকক্ষেত্রেই দলীয় গবেষণা হয়ে থাকে, যেখানে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনানুসারে অংশ নেন। ভূগর্ভের বিশেষ কোন স্তর থেকে খননকার্যের ফলে আবিস্কৃত কোন প্রাচীন মানব বসতির ধ্বংসাবশেষ থেকে সযত্নে উদ্ধারকৃত বিভিন্ন নমুনা বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানীরা জানার চেষ্টা করেন উক্ত বসতি কবেকার, সেখানকার মানুষেরা কি ধরনের উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ খাবার খেত, কি ধরনের হাতিয়ার ও তৈজসপত্র ব্যবহার করত, ইত্যাদি। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেলে প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানীরা সেসব সূত্র ধরে বোঝার চেষ্টা করেন অতীতের সেই মানুষগুলো কি ধরনের সমাজ ব্যবস্থার আওতায় বাস করত, তাদের উৎপাদন পদ্ধতি কেমন ছিল, তাদের মধ্যে ক্ষমতা বা মর্যাদার কোন পার্থক্য ছিল কি না, ইত্যাদি। বিশ্লেষণের এই পর্যায়ে গবেষককে অবশ্যই তার কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করতে হয়, তবে প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানীরা তা করেন বিভিন্ন যুক্তি, প্রমাণ ও সমাজ-সংস্কৃতি সংক্রান্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে। প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানীরা প্রায় সময়ই দৈহিক নৃবিজ্ঞানীদের সাথেও একযোগে কাজ করেন, কারণ খননকার্যের ফলে অতীতের মানুষদের রেখে যাওয়া বিভিন্ন বস্তুসামগ্রীর ধ্বংসাবশেষের পাশাপাশি অনেক সময় তাদের দেহাবশেষও পাওয়া যায়, যেগুলোর সূত্র ধরে দৈহিক নৃবিজ্ঞানীরা অনেক প্রাসঙ্গিক তথ্য উদ্ধার করতে পারেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে আমরা একদিকে যেমন প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণ কিছু ধারণা লাভ করি, তেমনি নির্দিষ্ট কোন দেশ বা অঞ্চলের প্রাক- ও প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কেও জানার সুযোগ পাই।

প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে আমরা একদিকে যেমন প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণ কিছু ধারণা লাভ করি, তেমনি নির্দিষ্ট কোন দেশ বা অঞ্চলের প্রাক- ও প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কেও জানার সুযোগ পাই। ধরা যাক আমরা জানতে চাই আজ থেকে পাঁচ দশ হাজার বছর আগে বাংলাদেশের কোন্ কোন্ অঞ্চলে মানব বসতি ছিল, এদেশের প্রাচীন অধিবাসীরা কোথায় কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করত, তাদের প্রযুক্তি কেমন ছিল, ইত্যাদি। এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে অবশ্যই প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা চালাতে হবে। বাংলাদেশে এ ধরনের গবেষণা এখনো খুব একটা হয় নি। অবশ্য সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ খোলা হয়েছে, তবে সেটা একই বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত এদেশের প্রথম নৃবিজ্ঞান বিভাগ হতে আলাদা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ যাবত যতগুলো নৃবিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়েছে, সবগুলোতেই মূলতঃ সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সে হিসাবে বাংলাদেশে প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানের কোন স্বতন্ত্র ঐতিহ্য তৈরী হয় নি। তবে প্রত্নতত্ত্ব, নৃবিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গবেষকরা একযোগে কাজ করলে বাংলাদেশের প্রাক- ও প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে নিশ্চয় আমরা অনেক কিছু জানতে পারব যা নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ও চেতনাকে সমৃদ্ধ করবে।

ভাষাতত্ত্ব

ভাষাতত্ত্ব বা ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যয়নের বিষয়বস্তু হল, আপনি নিশ্চয় জানেন বা ধারণা করতে পারবেন, ভাষা। বলা বাহুল্য, এখানে ভাষা বলতে শুধু মানব ভাষার কথাই বলা হচ্ছে। কাব্যিক উপমা হিসাবে 'পশুপাখির ভাষা' কথাটা আমরা ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু প্রাণীজগতে একমাত্র মানুষই ভাষার অধিকারী, কাজেই আলাদাভাবে 'মানব ভাষা' বলার দরকার পড়ে না। ভাষা মানব সমাজে তথ্য ও ভাব বিনিময়ের প্রধান মাধ্যম। পশুপাখিরাও বিভিন্ন ডাক ব্যবহার করে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে। কিন্তু অন্যান্য প্রাণীদের যোগাযোগ ব্যবস্থার (communication system) সাথে মানব ভাষার কিছু মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। আপনি হয়তবা লক্ষ্য করেছেন, পশুপাখিরা পরিস্থিতি ভেদে বিভিন্ন ডাক ব্যবহার করে, মানুষের ভাষায় যেগুলোর অর্থ হতে পারে অনেকটা এধরনের: 'কাছে এসো না, এটা আমার!', 'সাবধান, বিপদ!', 'আমি এইখানে, তুমি/তোমরা কোথায়?', 'বাঁচাও!' ইত্যাদি। পশুপাখিদের বেলায় এধরনের ডাকের সংখ্যা সীমিত এবং জৈবিকভাবে পূর্বনির্ধারিত, অর্থাৎ একই প্রজাতির কোন পশু বা পাখি সর্বত্রই সীমিত সংখ্যক কিছু অভিন্ন ডাক ব্যবহার করে। একটু চিন্তা করলেই দেখবেন, মানুষের বেলায় এক্ষেত্রে রয়েছে একটা বিরাট পার্থক্য। কোন একটা নির্দিষ্ট বস্তুকে আমরা কি নামে ডাকব, কোন্ পরিস্থিতিতে কি ধরনের শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করব, তা জৈবিকভাবে পূর্বনির্ধারিত থাকে না। প্রতিটা মানুষই ভাষা শেখে জন্মের পর। একজন শিশু পানিকে 'পানি' বলতে শিখবে, না 'জল' বা 'ওয়াটার', তা নির্ভর করে সে কোন্ সামাজিক পরিবেশে জন্মেছে, তার উপর। এই ধরনের বৈশিষ্ট্যের কারণে ভাষা মানুষকে কিছু বিশেষ ক্ষমতা দেয়। প্রতিটা ভাষাতেই সীমিত সংখ্যক কিছু মৌলিক ধ্বনি ব্যবহৃত হয় (যেগুলোর সংখ্যা সাধারণত ২৫-৩০টা বা বড়জোর ৫০টা হয়)। কিন্তু প্রতিটা ভাষাতেই এই সীমিত সংখ্যক ধ্বনিকে বিভিন্ন ভাবে মিলিয়ে হাজার হাজার শব্দ ব্যবহার করা হয় বা প্রয়োজনে নূতন নূতন শব্দ তৈরী করা যায়, এবং সেই শব্দগুলোকে নানানভাবে মিলিয়ে প্রায় অসীম সংখ্যক বাক্য তৈরী করা যায়। ফলে ভাষার মাধ্যমে দূরের-কাছের, অতীতের-ভবিষ্যতের, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-ইন্দ্রিয়াতীত, সম্ভব-অসম্ভব অসংখ্য বিষয় নিয়ে চিন্তা করার, তথ্য বিনিময়ের যে ক্ষমতা মানুষ অর্জন করেছে, এ ধরনের ক্ষমতা প্রাণীজগতে অন্য কোন প্রজাতির ক্ষেত্রে দেখা যায় না।

অন্যান্য প্রাণীদের যো ব্যবস্থার (commun system) সাথে মান কিছু মৌলিক ও গুরুত্ব পার্থক্য রয়েছে।

ভাষার মাধ্যমে দূরের-কাছের, অতীতের-ভবিষ্যতের, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-ইন্দ্রিয়াতীত, সম্ভব-অসম্ভব অসংখ্য বিষয় নিয়ে চিন্তা করার, তথ্য বিনিময়ের যে ক্ষমতা মানুষ অর্জন করেছে, এ ধরনের ক্ষমতা প্রাণীজগতে অন্য কোন প্রজাতির ক্ষেত্রে দেখা যায় না।

মানুষের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হিসাবে ভাষার স্বরূপ অধ্যয়ন ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম একটি লক্ষ্য। এই স্তরে ভাষাবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ভাষার পার্থক্য নিয়ে মাথা ঘামান না, বরং সকল ভাষার অভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি, সেদিকেই তাদের দৃষ্টি থাকে। অন্যদিকে ভাষাবিজ্ঞানীরা কোন নির্দিষ্ট ভাষার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ভাষার সম্পর্ক ও পার্থক্যও অধ্যয়ন করেন। কোন ভাষার মৌলিক ধ্বনিগুলো কি কি, ধ্বনিগুলো ব্যবহারের পদ্ধতি কি, এসব বিষয় অধ্যয়নের জন্য তৈরী হয়েছে ধ্বনিতত্ত্ব। অন্যদিকে ভাষার ব্যাকরণগত কাঠামো, ভাষার অর্থময় দিক, ইত্যাদি অধ্যয়নের জন্যও ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন আলাদা ক্ষেত্র বা শাখা রয়েছে। ভাষার অভ্যন্তরীণ কাঠামো ছাড়াও ভাষা ব্যবহারের সামাজিক প্রেক্ষাপট, ভাষার পরিবর্তনের গতি-প্রকৃতি, প্রভৃতি বিষয়ও অধ্যয়ন করা হয়। ভাষাতত্ত্বের এধরনের বিভিন্ন দিক রয়েছে যেগুলোর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। আমরা বরং যেদিকে নজর দেব তা হল নৃবৈজ্ঞানিক পরিসরে ভাষাতত্ত্ব চর্চার উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট।

মানুষের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হিসাবে ভাষার স্বরূপ অধ্যয়ন ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম একটি লক্ষ্য।

নৃবিজ্ঞানে ভাষাতত্ত্ব

উপরের আলোচনাতে আপনারা দেখেছেন যে, ভাষা হচ্ছে মানব প্রজাতির একটি অনন্য সম্পদ। নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে যারা একটি প্রজাতি হিসাবে মানুষের স্বরূপ বা বিবর্তনের ইতিহাস জানতে আগ্রহী, তাদের জন্য ভাষার বিশেষত্ব সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী ও গবেষণা খুবই প্রাসঙ্গিক। পৃথিবীর ইতিহাসে ঠিক কবে মানুষের আবির্ভাব ঘটল, অনেক নৃবিজ্ঞানীর কাছে এ প্রশ্নের একটা ভিন্ন রূপ হচ্ছে, মানব বিবর্তনের ঠিক কোন্ পর্যায়ে ভাষার আবির্ভাব ঘটল? হাজার হাজার বা লক্ষাধিক বছর আগে মানুষের পূর্বপুরুষরা ঠিক কি ধরনের ভাষা ব্যবহার করত, তা সরাসরি জানার কোন উপায় নেই, কিন্তু মানুষের কিছু জৈবিক বৈশিষ্ট্য - যেমন তার মগজের আয়তন, ধ্বনি উৎপাদনে সক্ষম বিশেষ কিছু প্রত্যঙ্গ - যেগুলো

তাকে ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা দিয়েছে, সেগুলোর বিবর্তন সম্পর্কে দৈহিক নৃবিজ্ঞানীরা আলোকপাত করতে পারেন।

সের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত রার নৃবিজ্ঞানের একটি া হিসাবে ভাষাতাত্ত্বিক বিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করা ছিল। এর একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আদিবাসী ারিকানদের ভাষাসমূহ অধ্যয়ন করা।

নৃবিজ্ঞানের আওতায় ভাষাতত্ত্ব চর্চার ধারাকে ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান বা নৃবৈজ্ঞানিক ভাষাতত্ত্ব বলা হয় (অর্থের কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য ছাড়াই উভয় নামকরণই নৃবিজ্ঞানে চালু রয়েছে)। বোয়াসের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত মার্কিন ধারার নৃবিজ্ঞানের একটি প্রধান শাখা হিসাবে ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এর একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আদিবাসী আমেরিকানদের ভাষাসমূহ অধ্যয়ন করা। আর সাধারণ ভাবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা সবাই বিশ্বের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে এমন সব জনগোষ্ঠীদের মধ্যে মাঠকর্ম করতেন যাদের ভাষাসমূহের কোন লিখিত রূপ ছিল না, এবং যেগুলো বিভিন্ন দিক থেকে নৃবিজ্ঞানীদের জানা ভাষা থেকে খুবই পৃথক। কাজেই মাঠকর্মের শুরুতেই অধিকাংশ নৃবিজ্ঞানীর প্রথম কাজ হয়ে দাঁড়াত অন্ততঃ কাজ চালানোর মত করে স্থানীয় ভাষা রপ্ত করা। এভাবে দেখা গেছে, গবেষণার বিষয়ের সাথে ভাষার কোন সরাসরি সম্পর্ক হয়ত নেই, কিন্তু একজন নৃবিজ্ঞানী তার গবেষণা এলাকার জনগোষ্ঠীর ভাষা ভালভাবে রপ্ত করেছেন, বা সে ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, কাঠামো ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করে ফেলেছেন। এসব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানও অনেক ক্ষেত্রে ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান চর্চার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়েছে।

ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বে পরস্পর-সদৃশ একাধিক ভাষার তুলনামূলক অধ্যয়নের মাধ্যমে ওই ভাষাগুলোর ঐতিহাসিক সম্পর্ক নিরূপণের চেষ্টা করা হয়।

ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানীদের অনেকের সংশ্লিষ্টতা দেখা গেছে ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব চর্চার সাথে। ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বে পরস্পর-সদৃশ একাধিক ভাষার তুলনামূলক অধ্যয়নের মাধ্যমে ওই ভাষাগুলোর ঐতিহাসিক সম্পর্ক নিরূপণের চেষ্টা করা হয়। আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, বাংলা, অহমিয়া, ওড়িয়া, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। ফলে প্রশ্ন করা সম্ভব, এই ভাষাগুলোর কাঠামো, শব্দভান্ডার কি একই উৎস থেকেই এসেছে? এসে থাকলে আদি-ভাষার বা ভাষাসমূহের কাঠামো বা শব্দভান্ডার কেমন ছিল? এ জাতীয় প্রশ্ন করার মাধ্যমে বিভিন্ন উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানীরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চেষ্টা করেন। এ ধরনের গবেষণার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা ও সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীদের ঐতিহাসিক সম্পর্ক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য বা তত্ত্ব পাওয়া গেছে। এ প্রসঙ্গে এখানে অবশ্য এ কথা যোগ করা দরকার যে, ভাষা, সংস্কৃতি ও নরবর্ণগত উৎপত্তির (racial origin) বিষয়গুলোকে একাকার করে দেখা ঠিক না। দুটো জনগোষ্ঠীর ভাষা বা সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ মিল থাকার অর্থ এই না যে তারা জাতিগতভাবেও একই উৎস থেকে এসেছে। অন্যদিকে মূলতঃ একই উৎস থেকে উদ্ভূত দুটো জনগোষ্ঠী ভাষাগতভাবে বা সাংস্কৃতিকভাবে অনেক দূরে সরে যেতে পারে। এসব ধারণা স্পষ্ট করার ক্ষেত্রে মার্কিন নৃবিজ্ঞানী বোয়াস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। বোয়াস ভাষা ও সংস্কৃতির ধারণাকেও পৃথক রাখতে চেয়েছিলেন, যার অর্থ হল দুটো জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষাগত মিল থাকলেও অন্যান্য দিক দিয়ে সাংস্কৃতিক পার্থক্য থাকতে পারে, আবার ভাষাগত পার্থক্য সত্ত্বেও অনেকক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক মিল থাকতে পারে।

অনেক নৃবিজ্ঞানী অবশ্য ভাষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ককে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন। বোয়াসের একজন ছাত্র এডওয়ার্ড সাপির তাঁর সহযোগী বেনজামিন হুয়ার্ফের সাথে মিলে একটা তাত্ত্বিক সম্ভাবনার রূপরেখা দিয়েছিলেন (যা Sapir-Whorf hypothesis নামে পরিচিত), যেটি অনুসারে একেকটা ভাষা নির্ধারণ করে দেয় সেই ভাষাভাষীরা চারপাশের সামাজিক ও প্রাকৃতিক জগতকে কিভাবে দেখে। ধারণাটা অনেকটা এরকম, বাংলা ভাষায় 'দেখতে সুন্দর/কালো' জাতীয় কথা ব্যবহৃত হয় বলে একজন বাংলাভাষী শিশু গায়ের রংকে সৌন্দর্যের মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করতে শুরু করে। এসব ক্ষেত্রে অবশ্য কার্য-কারণ সম্পর্কটা উল্টোভাবেও বিবেচনা করা যায়। যাই হোক, ভাষার সরাসরি কোন নির্ধারক ভূমিকা থাক বা না থাক, তাকে দেখা যায় সমাজের মূল্যবোধ, মতাদর্শ ইত্যাদির দর্পণ হিসাবে।

সাপিরদের তত্ত্বে আসলে সামাজিক পরিমন্ডলের চাইতে স্থান-কাল ইত্যাদি সংক্রান্ত বিমূর্ত ধারণার উপরই বেশী জোর দেওয়া হয়েছিল। এদিক থেকে সামাজিক ভাষাতত্ত্বে (sociolinguistics) ভাষা ও সমাজের সম্পর্ক অনেক বেশী সরাসরি অধ্যয়ন করা হয়। যেমন, বাংলায় আমরা কাউকে সম্বোধন করি 'তুমি' করে, কাউকে 'আপনি', আবার কাউকে 'তুই'। আবার এদেশে এটাও প্রায়ই দেখা যায়, একই ব্যক্তি স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ভাষা ব্যবহার করে--শুদ্ধ বাংলা, আঞ্চলিক/কথ্য ভাষা, ইংরেজী মেশানো বাংলা, ইত্যাদি। এসব বিষয় তলিয়ে দেখার মাধ্যমে আমরা এদেশের সামাজিক সম্পর্ক বা সমাজ কাঠামো সম্পর্কে কি বলতে পারি? এধরনের প্রশ্নের উত্তর নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যেও অনেকে খোঁজার চেষ্টা করেছে তাঁদের গবেষণার মাধ্যমে।

ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানী
গবেষণা ভাষা, সংস্কৃ
সমাজের আন্তঃসম্পর্ক
দৃষ্টিকোণ থেকে আমা
সামনে উদ্ভাসিত করে

স্পষ্টতই, ভাষার নৃবৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের বিবিধ ঐতিহ্য বা ধারা রয়েছে। একক ভাবে কোনটিকে হয়ত ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানের মূল প্রবণতা হিসাবে শনাক্ত করা যাবে না, কিন্তু একথা নিশ্চয় বলা যায় যে, সম্মিলিতভাবে ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণা ভাষা, সংস্কৃতি ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ককে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের সামনে উদ্ভাসিত করে চলছে।

সারাংশ

প্রত্নতত্ত্ব হচ্ছে সেই বিজ্ঞান, যা অতীতকালের মানুষদের রেখে যাওয়া বিভিন্ন বস্তু-সামগ্রীর ধ্বংসাবশেষ সুনিপূণ খননকার্যের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করে সেগুলোর ভিত্তিতে তাদের সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতি প্রভৃতির রূপরেখা পুনর্নির্মাণ করে। বিশ্বের অনেক দেশেই প্রত্নতত্ত্ব একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানকান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও অনেক জায়গায় আবার নৃবিজ্ঞানের একটি শাখা হিসাবেও এর চর্চা রয়েছে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। নৃবিজ্ঞানের একটি শাখা হিসাবে যখন এর চর্চা হয়, তখন তাকে প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান বা নৃবৈজ্ঞানিক প্রত্নতত্ত্ব বলা হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানকে প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বও (prehistoric archaeology) বলা হয়। প্রত্নতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য একজন নৃবিজ্ঞানীকে একাধারে ভূতত্ত্ব, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে হয়। ভূগর্ভের বিশেষ কোন স্তর থেকে খননকার্যের ফলে আবিস্কৃত কোন প্রাচীন মানব বসতির ধ্বংসাবশেষ থেকে সযত্নে উদ্ধারকৃত বিভিন্ন নমুনা বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানীরা জানার চেষ্টা করেন উক্ত বসতি কবেকার, সেখানকার মানুষেরা কি ধরনের উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ খাবার খেত, কি ধরনের হাতিয়ার ও তৈজসপত্র ব্যবহার করত, ইত্যাদি। প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানীরা প্রায় সময়ই দৈহিক নৃবিজ্ঞানীদের সাথেও একযোগে কাজ করেন। প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে আমরা একদিকে যেমন প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণ কিছু ধারণা লাভ করি, তেমনি নির্দিষ্ট কোন দেশ বা অঞ্চলের প্রাক- ও প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কেও জানার সুযোগ পাই। ভাষাতত্ত্ব বা ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যয়নের বিষয়বস্তু হল ভাষা। ভাষা মানব সমাজে তথ্য ও ভাব বিনিময়ের প্রধান মাধ্যম। ভাষার মাধ্যমে দূরের-কাছের, অতীতের-ভবিষ্যতের, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-ইন্দ্রিয়াতীত, সম্ভব-অসম্ভব অসংখ্য বিষয় নিয়ে চিন্তা করার, তথ্য বিনিময়ের যে ক্ষমতা মানুষ অর্জন করেছে, এ ধরনের ক্ষমতা প্রাণীজগতে অন্য কোন প্রজাতির ক্ষেত্রে দেখা যায় না। নৃবিজ্ঞানের আওতায় ভাষাতত্ত্ব চর্চার ধারাকে ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান বা নৃবৈজ্ঞানিক ভাষাতত্ত্ব বলা হয়। বোয়াসের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত মার্কিন ধারার নৃবিজ্ঞানের একটি প্রধান শাখা হিসাবে ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। বোয়াস ভাষা ও সংস্কৃতির ধারণাকেও পৃথক রাখতে চেয়েছিলেন, যার অর্থ হল দুটো জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষাগত মিল থাকলেও অন্যান্য দিক দিয়ে সাংস্কৃতিক পার্থক্য থাকতে পারে, আবার ভাষাগত পার্থক্য সত্ত্বেও অনেকক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক মিল থাকতে পারে। ভাষার

নৃবৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের বিবিধ ঐতিহ্য বা ধারা রয়েছে। একক ভাবে কোনটিকে হয়ত ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানের মূল প্রবণতা হিসাবে শনাক্ত করা যাবে না, কিন্তু একথা নিশ্চয় বলা যায় যে, সম্মিলিতভাবে ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণা ভাষা, সংস্কৃতি ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ককে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের সামনে উদ্ভাসিত করে চলছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন -

১। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বলতে বোঝায়
- ক. জাদুঘরে রাখা যে কোন জিনিসকে
- খ. মাটি খুঁড়ে পাওয়া অতীতের মানুষদের ব্যবহৃত জিনিসপত্রকে
- গ. পাথরের মূর্তিকে
- ঘ. জীবাশ্মকে

২। প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলতে বোঝায় সেই সময়কালকে
- ক. যখন মানুষ কাঁচা মাংস খেত
- খ. যখন মানুষ চাষাবাদ করত না
- গ. যখন পৃথিবীতে লিপির প্রচলন ছিল না
- ঘ. যখন খ্রীস্টাব্দ গণনা শুরু হয় নি

৩। নৃবিজ্ঞানের আওতায় ভাষাতত্ত্ব চর্চার ধারাকে বলা হয়
- ক. ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান
- খ. নৃবৈজ্ঞানিক ভাষাতত্ত্ব
- গ. ক ও খ উভয়ই
- ঘ. উপরের কোনটাই না

৪। সাপির ও হুয়ার্ফের মতে
- ক. ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই
- খ. প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিন্নতার কারণে ভাষার ভিন্নতা তৈরী হয়
- গ. সামাজিক পরিবেশই মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী করে, ভাষা নয়
- ঘ. ভাষা নির্ধারণ করে মানুষ কিভাবে দুনিয়াকে দেখে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। সামাজিক ভাষাতত্ত্ব (sociolinguistics) কী?
২। ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। প্রত্নতত্ত্ব কী ধরনের বিজ্ঞান? নৃবিজ্ঞানে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব আলোচনা করুন।
২। নৃবিজ্ঞানে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব আলোচনা করুন।

পাঠ - ৫

নৃবিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশ
Origin and Development of Anthropology

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- নৃবিজ্ঞানের উদ্ভবের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
- উনবিংশ শতাব্দীর নৃবিজ্ঞানে বিবর্তনবাদের গুরুত্ব
- বিদ্যাজগতে নৃবিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ লাভের ইতিহাস
- বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক প্রসার

নৃবিজ্ঞানের উদ্ভবের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

নৃবিজ্ঞানের আবির্ভাবকে দেখা যেতে পারে বিজ্ঞানের আলোকে নিজের সম্পর্কে মানুষের অতি পুরাতন কিছু প্রশ্নের নূতন উত্তর খোঁজার সংঘবদ্ধ প্রয়াস হিসাবে, যা সম্ভব হয়েছে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে, পাশ্চাত্যের ইতিহাসে এ ধরনের চর্চার অনুকূল বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক আবহ তৈরী হওয়ার পর।

নৃবিজ্ঞানের উদ্ভবের পেছনে যে অনুসন্ধিৎসা কাজ করেছে, তা একভাবে অতি পুরাতন। 'আমরা কোত্থেকে এলাম? এই দুনিয়ায় কে কোথায় দাঁড়িয়ে আছি? কে কোথায় যাচ্ছি?' এ ধরনের প্রশ্ন কোন না কোন আকারে সম্ভবত উচ্চারিত হয়েছে পৃথিবীর বুকে চিন্তাক্ষম মানুষের আবির্ভাবের সময় থেকেই। প্রায় প্রত্যেক সংস্কৃতিতেই মানুষ, প্রকৃতি ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি সম্পর্কে কিছু 'মিথ' বা সৃষ্টিকাহিনী চালু রয়েছে। এসব কাহিনী যে সবসময় সকলের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে তা নয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারের আগ পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মীয় বা পৌরাণিক ব্যাখ্যার মাধ্যমেই মানব প্রকৃতি ও উৎপত্তি-রহস্য সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর সাধারণভাবে খোঁজা হয়েছে। সেদিক থেকে নৃবিজ্ঞানের আবির্ভাবকে দেখা যেতে পারে বিজ্ঞানের আলোকে নিজের সম্পর্কে মানুষের অতি পুরাতন কিছু প্রশ্নের নূতন উত্তর খোঁজার সংঘবদ্ধ প্রয়াস হিসাবে, যা সম্ভব হয়েছে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে, পাশ্চাত্যের ইতিহাসে এ ধরনের চর্চার অনুকূল বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক আবহ তৈরী হওয়ার পর।

নৃবিজ্ঞানকে অনেক সময় 'অন্যকে অধ্যয়নের বিজ্ঞান' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এই 'অন্য' হতে পারে পুরো মানব প্রজাতির প্রেক্ষিতে অন্যান্য প্রাণী, বা বর্তমান কালের মানুষদের প্রেক্ষিতে সুদূর অতীতের মানুষেরা, বা নৃবিজ্ঞান চর্চার প্রবর্তকদের চোখে সভ্যতার মাপকাঠিতে

নৃবিজ্ঞানকে অনেক সময় 'অন্যকে অধ্যয়নের বিজ্ঞান' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এই 'অন্য' হতে পারে পুরো মানব প্রজাতির প্রেক্ষিতে অন্যান্য প্রাণী, বা বর্তমান কালের মানুষদের প্রেক্ষিতে সুদূর অতীতের

মানুষেরা, বা নৃবিজ্ঞান চর্চার প্রবর্তকদের চোখে সভ্যতার মাপকাঠিতে তাদের নিজেদের সমাজ থেকে পিছিয়ে থাকা অন্যরা। আসলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষের নিজের সম্পর্কে জানার কৌতুহল আর অন্যকে জানার কৌতুহল অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। অন্যকে জানার মাধ্যমে, বা 'অন্য কে?' এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মাধ্যমেই মানুষ সর্বত্র 'নিজ' সম্পর্কে ধারণা তৈরী করেছে। সকল মানব সমাজেই বিভিন্ন আকারে 'আমরা' ও 'ওরা' ধরনের ভিন্নতার বোধ তৈরী করা হয়। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন সমাজ স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন প্রাচীন কালের বেশ কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি। এই প্রেক্ষিতে 'ইতিহাসের জনক' বলে খ্যাত খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীক ইতিহাসবিদ হেরোডোটাসকে কোন কোন নৃবিজ্ঞানী নিজেদেরও পূর্বসূরী হিসাবে গণ্য করেন, কারণ গ্রীস ও পারস্যের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের যে ইতিহাস তিনি লিখেছিলেন, তাতে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের মাধ্যমে লব্ধ নিজের অভিজ্ঞতাসহ বিভিন্ন তথ্য তিনি যথেষ্ট বিচার-বিশ্লেষণ সহকারেই উপস্থাপন করেছিলেন। কোন কোন নৃবিজ্ঞানী আবার প্লেটো বা এ্যারিস্টটলের মধ্যে নৃবৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার দার্শনিক ভিত্তির উৎস খুঁজে পান। এমন একটা গল্প চালু আছে যে, মানুষের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে প্লেটো ও তাঁর শিক্ষার্থীরা মিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, 'মানুষ হচ্ছে একটি পালকবিহীন দ্বিপদ প্রাণী'। এ কথা শুনে অন্য এক গ্রীক দার্শনিক ডায়োজিনিস নাকি একটি মোরগের সকল পালক উঠিয়ে সেটাকে প্লেটোর সভায় হাজির করে বলেছিলেন, 'প্লেটোর মানুষ', যার প্রেক্ষিতে উক্ত সংজ্ঞায় সংশোধনী আনা হয় বাড়তি একটি শর্ত যুক্ত করে: 'নখর-বিহীন'।

একটি জ্ঞানকান্ড হিসাবে নৃবিজ্ঞানের উদ্ভবের সার্বিক প্রেক্ষাপট অবশ্য তৈরী হয়েছিল আরো অনেক পরে, যা আমরা ইউরোপীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মোটামুটি বিগত পাঁচ শতাব্দীর মধ্যে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের আলোকে দেখতে পারি। আজ থেকে পাঁচশ' বছরের কিছু আগে সংঘটিত কলম্বাসের নৌ-অভিযাত্রার মাধ্যমে ইউরোপীয়রা তখন পর্যন্ত তাদের সম্পূর্ণ অজানা নূতন নূতন ভূখন্ডের খোঁজ পায়--ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ সহ দুইটি বিশাল মহাদেশ--যেগুলিকে তারা একত্রে 'নূতন বিশ্ব' (New World) নামে অভিহিত করতে শুরু করে। এই 'নূতন বিশ্বে'র সন্ধান লাভ ইউরোপীয়দের ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের পথ খুলে দেওয়ার পাশাপাশি তাদের চিন্তা-চেতনাতেও বিপুল আলোড়ন তুলেছিল। তখন পর্যন্ত অধিকাংশ ইউরোপীয় চিন্তাবিদরা বাইবেলের ভিত্তিতেই চেনা জগতকে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু এই নূতন বিশ্বের অস্তিত্ব বা সেখানকার মানুষদের উৎস ব্যাখ্যার জন্য বাইবেল থেকে স্পষ্ট কোন সূত্র পাওয়া যাচ্ছিল না। অন্যদিকে প্রায় একই সময়কালে পোলিশ জ্যোতির্বিদ কোপার্নিকাস এ ধারণা প্রথম নিয়ে আসেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, যেটা গ্যালিলিওর মাধ্যমে আরো প্রতিষ্ঠিত হয়। আপনি নিশ্চয় জানেন যে গ্যালিলিও তার মতামতের জন্য শাস্তি ও হয়রানির শিকার হয়েছিলেন তৎকালে ক্ষমতার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত চার্চ কর্তৃপক্ষের হাতে, যারা গ্যালিলিওর সূর্য-কেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণাকে মেনে নিতে পারে নি, কারণ ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে ভাবা হত মানুষ ও পৃথিবীকেই।

একটি জ্ঞানকান্ড হিসাবে নৃবিজ্ঞানের উদ্ভবের সার্বিক প্রেক্ষাপট আমরা ইউরোপীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মোটামুটি বিগত পাঁচ শতাব্দীর মধ্যে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের আলোকে দেখতে পারি।

'নূতন বিশ্বে'র সন্ধান লাভ ইউরোপীয়দের ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের পথ খুলে দেওয়ার পাশাপাশি তাদের চিন্তা-চেতনাতেও বিপুল আলোড়ন তুলেছিল।

তবে নানা কারণে চার্চের পক্ষে আর সম্ভব ছিল না পুরাতন বিশ্ববীক্ষার আধিপত্য টিকিয়ে রাখা। কারণ সময়টা ছিল ইউরোপীয়দের জন্য নূতন করে জেগে ওঠার, বা রেনেসাঁর, যা ইতালীতে সূচিত হয় প্রাচীন গ্রীসের শিল্প, সাহিত্য ও দর্শন পুনরাবিস্কারের মাধ্যমে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুদ্রণ প্রযুক্তির উদ্ভাবন সুগম করে দিয়েছিল নূতন নূতন ধ্যান-ধারণা দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়ার রাস্তা। রোমান ক্যাথলিক চার্চ থেকে বেরিয়ে তৈরী হয় নূতন নূতন সংস্কারবাদী ধর্মীয় সম্প্রদায়, যারা সামগ্রিক ভাবে প্রটেস্টান্ট নামে পরিচিত। এসব পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে সংঘটিত হয় বড় ধরনের দু'টি রাজনৈতিক বিপ্লব: আমেরিকান বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লব, যেগুলি যথাক্রমে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের ভিত্তি নাড়িয়ে বা ভেঙে দেয়। ততদিনে শিল্প বিপ্লবও শুরু হয়ে গেছে, যা গোটা পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে উৎপাদন ব্যবস্থার

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এনলাইটেনমেন্ট (Enlightenment) নামে পরিচিত বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে যুক্তি, বিজ্ঞান ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের একটা দৃঢ় ভিত্তি রচিত হয়।

আমূল পরিবর্তন আনে। অভিজাত সামন্তশ্রেণীর জায়গায় ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে আসে নগর-ভিত্তিক একটি শ্রেণী - বুর্জোয়া ('শহুরে') পুঁজিপতিরা, অর্থাৎ কল-কারখানা, ব্যাংক ইত্যাদির মালিকরা। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই চিন্তাজগতেও ঘটে যায় একধরনের বিপ্লব - এনলাইটেনমেন্ট (Enlightenment) নামে পরিচিত বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে যুক্তি, বিজ্ঞান ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের একটা দৃঢ় ভিত্তি রচিত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিক-লেখক-চিন্তাবিদদের মধ্যে অনেকেরই নাম উল্লেখ করা যায় - যেমন, মন্তেস্ক্যু, জাঁ-জাক রুশো, ভিকো প্রমুখ - যাদেরকে নৃবিজ্ঞানীদের কেউ না কেউ তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিক পূর্বসূরীদের তালিকায় রাখেন। এনলাইটেনমেন্ট চিন্তার একটা কেন্দ্রীয় ধারণা ছিল এই যে, মানব সমাজ সময়ের সাথে সাথে ক্রমবিকশিত হয়। মানব 'প্রগতি'র ইতিহাস নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে গিয়ে অনেকেই নজর দিয়েছিলেন সবচাইতে আদিম হিসাবে বিবেচিত 'বন্য' (savage) মানুষদের দিকে, অর্থাৎ যারা শুধু শিকার ও ফলমূল আহরণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। মানব সমাজ প্রগতির পথে ক্রমান্বয়ে শিকার থেকে পশুপালন হয়ে কৃষি ও বাণিজ্যের দিকে অগ্রসর হয়েছে, এই ধারণা বেশ ব্যাপকতা পেয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই। 'এ্যান্থ্রোপলজি' শব্দটা অবশ্য তখনো মূলতঃ 'দৈহিক নৃবিজ্ঞান' বলতে এখন আমরা যা বুঝি, সে অর্থেই ব্যবহৃত হত। অন্যদিকে এথনোগ্রাফি ও এথনোলজি বা সমতুল্য অন্য কোন নামে গড়ে ওঠা জ্ঞানচর্চার কিছু ধারার প্রসার ঘটতে থাকে (বিশেষতঃ জার্মানভাষী দেশগুলোসহ মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের অন্যত্র) যেগুলোর নজর কেবল ইউরোপের বাইরের 'আদিম' সমাজগুলোর প্রতি নয়, ইউরোপের ভেতরকার জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতিও ছিল। এই ধারাগুলোর অনেকটাই পরবর্তীতে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের আওতায় চলে এসেছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বন্য ও আদিম হিসাবে চিহ্নিত সমাজগুলোর ব্যাপারে ইউরোপীয়দের কৌতুহল শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার ব্যাপার ছিল না, এর সাথে যুক্ত ছিল রোমান্টিকতার ধারাও - যার ফলে কারো কারো কাছে 'বন্য'রা হয়ে ওঠে প্রাকৃতিক সারল্য ও সৌন্দর্যের প্রতীক।

মানব 'প্রগতি'র ইতি
চিন্তাভাবনা করতে গি
অনেকেই নজর দিয়ে
সবচাইতে আদিম হি
বিবেচিত 'বন্য' (sav
মানুষদের দিকে।

বিবর্তনবাদ ও উনবিংশ শতাব্দীর নৃবিজ্ঞান

একটি সমন্বিত জ্ঞানকান্ড হিসাবে নৃবিজ্ঞানের উদ্ভব মূলতঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসেই ঘটেছিল।

একটি সমন্বিত জ্ঞানকান্ড হিসাবে নৃবিজ্ঞানের উদ্ভব মূলতঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসেই ঘটেছিল। তখনো নৃবিজ্ঞান চর্চার মূল প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র ছিল ইউরোপের একাধিক দেশ ও আমেরিকায় গড়ে ওঠা বিভিন্ন জাতিতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা (ethnographical museums) ও জাতিতাত্ত্বিক সমিতি (ethnological societies)। এসব কেন্দ্রে বিভিন্ন তথ্য ও বস্তুসামগ্রীর যে বিশাল সংগ্রহ গড়ে উঠছিল, সেগুলির শ্রেণীকরণ ও বিশ্লেষণের জন্য দরকার ছিল একটা সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিক কাঠামো। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিবর্তনবাদী চিন্তাচেতনার প্রসার এই চাহিদা মেটায়। বিবর্তনবাদের মূল কথা ছিল, মানব সমাজ সর্বত্রই কিছু সাধারণ ও বিশ্বজনীন নিয়ম অনুসারে ধাপে ধাপে রূপান্তরিত হয়ে চলছে, সরল ও আদিম রূপ থেকে ক্রমশ জটিল ও উন্নত রূপ ধারণ করছে। বিবর্তনবাদীদের লক্ষ্য ছিল সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন মৌলিক উপাদানের আদিরূপ চিহ্নিত করা, এবং তা থেকে ধাপে ধাপে পরবর্তী রূপগুলোর ক্রমবিকাশের সূত্র খুঁজে বের করা।

বিবর্তনবাদীদের লক্ষ্য ছিল সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন মৌলিক উপাদানের আদিরূপ চিহ্নিত করা, এবং তা থেকে ধাপে ধাপে পরবর্তী রূপগুলোর ক্রমবিকাশের সূত্র খুঁজে বের করা।

যদিও বিবর্তন শব্দটা শুনলে আমরা অনেকেই সর্বাগ্রে ডারউইনের কথাই ভাবি, প্রকৃতপক্ষে জৈবিক বিবর্তন সম্পর্কে তাঁর তত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার আগেই সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারণা সংগঠিত হতে শুরু করেছিল। তবে ডারউইন যখন ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত *Origin of Species* গ্রন্থের মাধ্যমে ইঙ্গিত দেন, এবং কিছু বছর পরে *The Descent of Man* গ্রন্থে (১৮৭১) স্পষ্ট করেই বলেন যে, বানর জাতীয় কোন প্রাণীর ক্রমবিবর্তিত রূপ হল আজকের মানুষ, এই তত্ত্বটা চিন্তাজগতে গভীর ও সুদূরপ্রসারী আলোড়ন তুলেছিল। ডারউইনের তত্ত্বের আলোকে এবং ক্রমশঃ আবিস্কৃত হতে থাকা বিভিন্ন মানব জীবাশ্মের ভিত্তিতে মানুষের দৈহিক বিবর্তনের একটা রূপরেখা দাঁড় করানোর কাজ শুরু করে দেন দৈহিক নৃবিজ্ঞানীরা।

ডারউইনের গ্রন্থসমূহ প্রকাশের আগে পরে দুই দশকের কম সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত হয় অন্য আরো কয়েকজনের গ্রন্থ যেগুলো সম্মিলিতভাবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারণাকে নৃবিজ্ঞানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

অন্যদিকে ডারউইনের গ্রন্থসমূহ প্রকাশের আগে পরে দুই দশকের কম সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত হয় অন্য আরো কয়েকজনের গ্রন্থ যেগুলো সম্মিলিতভাবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারণাকে নৃবিজ্ঞানে

দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। ইংরেজ ইতিহাসবিদ হেনরি মেইন তাঁর *Ancient Law* (১৮৬১) গ্রন্থে বলেন যে পদমর্যাদার ভিত্তিতে সংগঠিত সমাজ থেকে বিবর্তিত হয়ে আবির্ভাব ঘটে সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে সংগঠিত সমাজ, গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ থেকে রাষ্ট্র। সুইজারল্যান্ডের আইনজ্ঞ বাকোফেন *Das Mutterecht* (১৮৬১) গ্রন্থে তাঁর এই অনুমান প্রকাশ করেন যে মানব সমাজের আদিরূপ ছিল মাতৃতান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা এসেছে পরে। *Primitive Culture* (১৮৭১) গ্রন্থে ইংরেজ নৃবিজ্ঞানী টায়লর এই তত্ত্ব দেন যে ধর্মের মূলে রয়েছে আত্মার ধারণা, যা থেকে পর্যায়ক্রমে ভূত-প্রেত, দেব-দেবী ও সবশেষে ইশ্বরের ধারণা এসেছে। উল্লেখ্য, একই গ্রন্থে টায়লর সংস্কৃতিকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন সামাজিক ভাবে অর্জিত মানুষের জ্ঞান, রীতি-নীতি, আচার-প্রথা প্রভৃতির সমন্বিত রূপ হিসাবে, যে ধরনের অর্থে 'সংস্কৃতি' ধারণা ততদিনে নৃবৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার প্রধান বাহন হয়ে উঠেছিল। মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সবচাইতে বিস্তারিত রূপরেখা দিয়েছিলেন মার্কিন নৃবিজ্ঞানী মর্গান, তাঁর *Ancient Society* (১৮৭৭) নামক গ্রন্থে, (এটির বাংলা অনুবাদ রয়েছে 'আদিম সমাজ' শিরোনামে), যেখানে তিনি প্রযুক্তি ও উৎপাদন ব্যবস্থার ধরন অনুযায়ী সামাজিক বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপ চিহ্নিত করেন, এবং এই ধারণা দেন যে একটা বিশ্বজনীন প্রক্রিয়ায় 'বন্য' অবস্থা থেকে একে একে বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে এসেছে 'সভ্য' সমাজ। উল্লেখ্য, মর্গানের বিভিন্ন পর্যবেক্ষণেরই মার্ক্সীয় ভাষ্য হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল এঙ্গেলসের 'পরিবার, রাষ্ট্র ও ব্যক্তিমালিকানার উৎপত্তি' নামক সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে একসময় বহুল পঠিত গ্রন্থ।

বিদ্যাজগতে নৃবিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

আমেরিকা ও ব্রিটেনসহ অন্যান্য পশ্চিমা দেশে বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক একটি জ্ঞানকান্ড হিসাবে নৃবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্ত থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত। আমেরিকায় বোয়াস, ইংল্যান্ডে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন ও ম্যালিনোস্কি, এবং ফ্রান্সে ডুর্খাইমের তত্ত্বাবধানে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নৃবিজ্ঞানীদের একটি নূতন প্রজন্ম গড়ে ওঠে, যারা শৌখিন জাতিতত্ত্ববিদদের হাত থেকে নৃবিজ্ঞান চর্চার কর্তৃত্ব নিয়ে নেন এবং বিবর্তনবাদের বিরোধিতা করে নৃবিজ্ঞান চর্চার নূতন তাত্ত্বিক কাঠামো ও পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। এমন না যে বিবর্তনের ধারণাকে তাঁরা পুরোপুরি অস্বীকার করেছিলেন, কিন্তু বিবর্তনবাদীদের ঢালাও সাধারণীকরণ বা সে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন অনুমান, তত্ত্ব ও পদ্ধতি তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না।

আমেরিকা ও ব্রিটেনসহ অন্যান্য পশ্চিমা দেশে বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক একটি জ্ঞানকান্ড হিসাবে নৃবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্ত থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত।

বোয়াস শুধু বিবর্তনবাদীদের তত্ত্ব ও পদ্ধতির সমালোচনা করেন নি, বিবর্তনবাদের পাল্টা হিসাবে ব্যাপ্তিবাদ (diffusionism) নামে পরিচিত যেসব তত্ত্ব প্রবর্তিত হয়েছিল, সেগুলিরও বিরোধিতা করেছিলেন ক্ষেত্র বিশেষে। বিবর্তনবাদী ও ব্যাপ্তিবাদী উভয় ধারারই লক্ষ্য ছিল সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা। এক্ষেত্রে বিবর্তনবাদীরা সাধারণভাবে মনে করতেন, দুটো সমাজের সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যের অর্থ হল, তারা সমান্তরাল প্রক্রিয়ায় বিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার পথে একই ধাপে অবস্থান করছে। অন্যদিকে ব্যাপ্তিবাদীরা মনে করতেন, দুটো সমাজের মধ্যে কোন ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য থাকার অর্থ হচ্ছে, এক সমাজের উদ্ভাবন অন্য সমাজ গ্রহণ করেছে, অথবা উভয় সমাজই অন্য কোন অভিন্ন উৎস থেকে সমরূপ বৈশিষ্ট্যগুলো পেয়েছে। বিবর্তনবাদী ও ব্যাপ্তিবাদী উভয় ধরনের ব্যাখ্যাতেই অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপাত্তসমূহের বিস্তারিত প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা হত না, বা কল্পনার দৌড় বৈজ্ঞানিক গ্রহণযোগ্যতার সীমা ছাড়িয়ে যেত। তাই বিভিন্ন সমাজের সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যকে ঢালাও কোন

বিভিন্ন সমাজের সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যকে ঢালাও কোন সাধারণীকরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে বোয়াস জোর দিয়েছিলেন একেকটা সংস্কৃতি সম্পর্কে যতটা সম্ভব বিস্তারিত বিবরণ সরেজমিনে সংগ্রহ করার উপর।

সাধারণীকরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে বোয়াস জোর দিয়েছিলেন একেকটা সংস্কৃতি সম্পর্কে যতটা সম্ভব বিস্তারিত বিবরণ সরেজমিনে সংগ্রহ করার উপর।

অন্যদিকে ব্রিটেনে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন ও ম্যালিনোস্কি বিবর্তনবাদকে অগ্রাহ্য বা বাতিল করেছিলেন 'ক্রিয়াবাদী' দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁরা মনে করতেন, সমাজ বা সংস্কৃতিকে বোঝার জন্য এর বিভিন্ন উপাদানের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে, তা জানার দরকার নেই, বরং এই উপাদানগুলো কিভাবে কাজ করে, পুরো ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে কোন্‌টার কি ভূমিকা, সেটাই হওয়া উচিত নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রধান লক্ষ্য। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন ছিলেন ডুর্খাইম প্রবর্তিত সমাজতাত্ত্বিক ধারার ঘনিষ্ঠ অনুসারী। অন্যদিকে সমাজ বা সংস্কৃতি সম্পর্কে ম্যালিনোস্কির তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী অনেকের বিবেচনায় সমাজতাত্ত্বিকভাবে দুর্বল হলেও বর্তমান পাপুয়া নিউ গিনির ট্রব্রিয়ান্ড দ্বীপপুঞ্জে দীর্ঘমেয়াদী মাঠকর্মের যে অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন - যার ভিত্তিতে বেশ কয়েকটি সমৃদ্ধ এথনোগ্রাফি তিনি রচনা করেছিলেন - তা বিবেচিত হয়েছিল অনুকরণীয় একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে। এভাবে ব্যক্তি বিশেষে তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর যে পার্থক্যই থাকুক না কেন, নূতন প্রজন্মের সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা প্রায় সকলেই তাদের প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে কোন না কোন ভিন্ন সমাজে ('আদিম', 'সরল', 'অনক্ষর' ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত) দীর্ঘমেয়াদী গবেষণার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতেন। নৃবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও মাঠকর্মের উপর বেশ জোর দেওয়া হত - জীবাশ্ম অনুসন্ধান, প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাইমেটদের সামাজিক আচরণ পর্যবেক্ষণ, প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য সম্পাদন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে। এভাবে বিচিত্র সব স্থান, সমাজ বা বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্টতা হয়ে ওঠে অন্যদের চোখে নৃবিজ্ঞানীদের পরিচিতির প্রধান উপাদান।

ব্রিটেনে র‍্যাডক্লিফ-ব্রা ম্যালিনোস্কি বিবর্তনব অগ্রাহ্য বা বাতিল ক 'ক্রিয়াবাদী' দৃষ্টিকোণ

মার্কিন, ব্রিটিশ প্রভৃতি সংস্করণে বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক একটি জ্ঞানকান্ড হিসাবে আত্মপ্রকাশের পর বেশ দ্রুতগতিতেই পশ্চিমা দেশগুলোতে নৃবিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক প্রসার ঘটেছিল, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। (নৃবিজ্ঞানের প্রসার সবচেয়ে বেশী ঘটেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যেখানে বিভিন্ন পর্যায়ের অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ বিষয় পড়ানো হয়, এবং বর্তমানে প্রায় ৯০টা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর কয়েকশত পিএইচ ডি ডিগ্রী দেওয়া হয়।) এই প্রসারকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? প্রশ্নটার কোন সরল উত্তর দেওয়া যাবে না, তবে একটা উত্তর দিতে হলে যেসব বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে, সেগুলির দু'একটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। পশ্চিমা দেশসমূহের শিক্ষাকার্যক্রমে নৃবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তিকে অনেকেই দেখেন দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি মানবিক শাস্ত্রসমূহ পঠন-পাঠনের ঐতিহ্যের আলোকে। পশ্চিমা বিশ্বের উদারনৈতিক শিক্ষাব্যবস্থার আওতায় স্নাতক পর্যায়ে এসব বিষয় ব্যাপকভাবে পড়ানো হয় মূলতঃ সাধারণ শিক্ষার অন্তর্গত একটি সহায়ক বিষয় হিসাবে, বিশেষজ্ঞ তৈরীর লক্ষ্যে নয়। ধরে নেওয়া হয় যে, নৃবিজ্ঞানের মত বিষয়ে পড়াশুনা একজন শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রসারিত করবে। তবে সবাই বিষয়টাকে অতটা নির্দোষ মনে করেন না। বরং এমন অভিযোগ তোলা হয়েছে যে, নৃবিজ্ঞান চর্চার একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উপনিবেশের জনগোষ্ঠীদের সম্পর্কে জানার মধ্য দিয়ে তাদের শাসন করার যথাযথ কৌশল প্রণয়ন। এ নিয়ে নৃবিজ্ঞানে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে, যা একভাবে এখনো চলছে। এসব বিতর্ক থেকে একটা বিষয় অন্তত স্পষ্ট হয়েছে যে, বেশীরভাগ নৃবিজ্ঞানীই হয়ত সরাসরি বা সচেতনভাবে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করেননি, কিন্তু সার্বিকভাবে নৃবিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটেছিল বিশ্বের ইতিহাসে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক উত্থান ও আধিপত্যের সূত্রেই, যে আধিপত্যকে অনিবার্য বা স্বাভাবিক হিসাবে প্রতীয়মান করে তোলার ক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

পশ্চিমা দেশসমূহের শিক্ষাকার্যক্রমে নৃবিজ্ঞ অন্তর্ভুক্তিকে অনেকেই দর্শন, সাহিত্য, ইতিহ মানবিক শাস্ত্রসমূহ প পাঠনের ঐতিহ্যের আ

অভিযোগ তোলা হয়েছে যে, নৃবিজ্ঞান চর্চার একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উপনিবেশের জনগোষ্ঠীদের সম্পর্কে জানার মধ্য দিয়ে তাদের শাসন করার যথাযথ কৌশল প্রণয়ন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে পশ্চিমা বিশ্বের নৃবিজ্ঞান চর্চায় ব্যাপক রদবদল ঘটতে শুরু করে, যার কিছুটা আগেই (পাঠ ২) আলোচিত হয়েছে। ষাট ও সত্তরের দশকে নৃবিজ্ঞানের সকল ধারাতেই নূতন গবেষণাক্ষেত্র, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, নূতন তাত্ত্বিক কাঠামো, নূতন পদ্ধতির অন্বেষা লক্ষ্য করা গেছে। এভাবে নৃবিজ্ঞানে একধরনের খন্ডায়ন প্রক্রিয়া সূচিত হয়েছে। যেমন, চার-শাখা ভিত্তিক মার্কিন ধারার নৃবিজ্ঞান এখনো অনেক জায়গাতেই কাগজে কলমে রয়েছে, কিন্তু বিশেষায়নের প্রসার তথা দৃষ্টিভঙ্গীর বহুধাবিভক্তির কারণে বাস্তবে এগুলির কোন সমন্বিত রূপ এখন শনাক্ত করা মুশকিল। আর বিগত দুই-তিন দশকের মধ্যে 'উত্তর-' উপসর্গযুক্ত বিভিন্ন নামে পরিচিত সাধারণ প্রবণতা বিদ্যাজগতে ঢেউ

ষাট ও সত্তরের দশকে নৃবিজ্ঞানের সকল ধারাতেই নূতন গবেষণাক্ষেত্র, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, নূতন তাত্ত্বিক কাঠামো, নূতন পদ্ধতির অন্বেষা লক্ষ্য করা গেছে। এভাবে নৃবিজ্ঞানে একধরনের খন্ডায়ন প্রক্রিয়া সূচিত হয়েছে।

তুলেছিল, সেগুলির ধাক্কা নৃবিজ্ঞানেও এসে লেগেছে--উত্তর-আধুনিকতাবাদ, উত্তর-কাঠামোবাদ, উত্তর-মার্ক্সবাদ ইত্যাদি। সাম্প্রতিককালে পশ্চিমা ধনতান্ত্রিক সমাজসমূহে শিল্পকলা, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি ক্ষেত্রে 'আধুনিকতা'র ধারণা এবং এর বিভিন্ন অনুষঙ্গকে পরীক্ষা করে দেখার, সন্দেহের চোখে দেখার, প্রত্যাখ্যান করার যে প্রবণতা চলছে, তাকেই সাধারণভাবে 'উত্তর-আধুনিকতাবাদ' (postmodernism) হিসাবে অভিহিত করা হয়। এই প্রবণতার অংশ হিসাবে নৃবিজ্ঞানীদেরও অনেকে নিজেদের জ্ঞানকান্ডে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রত্যয়, তত্ত্ব, পদ্ধতি ও গ্রন্থের পুনঃপরীক্ষণে মনোনিবেশ করেছেন।

পশ্চিমা দেশগুলোতে কর্মসংস্থানের দিক থেকেও নৃবিজ্ঞানীদের নূতন ক্ষেত্রের সন্ধান করতে হয়েছে। যেমন, একটা সময় ছিল, যখন আমেরিকায় নৃবিজ্ঞানের ডক্টরেটরদের বেশীর ভাগেরই (৮৫ শতাংশ পর্যন্ত) কর্মক্ষেত্র ছিল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, কিন্তু বর্তমানে তাদের অর্ধেকের বেশী নিয়োজিত রয়েছেন বিদ্যাজগতের বাইরে বিভিন্ন বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে, যেগুলোর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হল নানা ধরনের 'উন্নয়ন' সংস্থা।

বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞানের প্রসার

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানকান্ড হিসাবে নৃবিজ্ঞানের আবির্ভাব ঘটেছে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে। সর্বপ্রথম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৫ সালে নৃবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর একে একে ঢাকা, শাহ জালাল (সিলেট), চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও নৃবিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়েছে এবং আরো দু'একটিতে খোলা হতে পারে। অবশ্য বাংলদেশের বিদ্যাজগতে নৃবিজ্ঞান সম্পূর্ণ অপরিচিত কোন বিষয় ছিল না। যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ ছিল, সেগুলোতে নৃবিজ্ঞানের কিছু কোর্স পড়ানোর রেওয়াজ ছিল। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির মত বিষয়ে অধ্যাপনারত শিক্ষকদের বেশ কয়েকজন বিদেশে উচ্চতর পড়াশুনা করেছিলেন নৃবিজ্ঞানে। স্বভাবতই তাঁরা এদেশে একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানকান্ড হিসাবে নৃবিজ্ঞানের আত্মপ্রকাশে ভূমিকা রেখেছেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নৃবিজ্ঞান বলতে মূলত সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানকেই বোঝানো হচ্ছে।

লক্ষ্যণীয় যে, একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানকান্ড হিসাবে বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞানের প্রসার ঘটেছে এমন একটা সময়ে যখন পাশ্চাত্যে এটি একধরনের ভাটা ও ভাঙনের মুখে রয়েছে। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞান চর্চার সাথে যাঁরা যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের যে ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে সেগুলো হল: এ দেশে নৃবিজ্ঞান চর্চার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি? পাশ্চাত্যের নৃবিজ্ঞানের কতটা আমরা গ্রহণ করব? কোন্ ধরনের নৃবিজ্ঞান আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক হবে? এ দেশীয় নৃবিজ্ঞানের কোন স্বতন্ত্র ধারা গড়ে তোলার প্রয়োজন ও সুযোগ কতটুকু? এসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক সবে শুরু হয়েছে। নৃবিজ্ঞান বিষয়ে পড়তে গিয়ে আপনিও এগুলো নিয়ে ভেবে দেখতে পারেন।

একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানকান্ড হিসাবে বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞানের প্রসার ঘটেছে এমন একটা সময়ে যখন পাশ্চাত্যে এটি একধরনের ভাটা ও ভাঙনের মুখে রয়েছে।

সারাংশ

একটি সমন্বিত জ্ঞানকান্ড হিসাবে নৃবিজ্ঞানের উদ্ভব মূলতঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসেই ঘটেছিল। তখনো নৃবিজ্ঞান চর্চার মূল প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র ছিল ইউরোপের একাধিক দেশ ও আমেরিকায় গড়ে ওঠা বিভিন্ন জাতিতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা (ethnographical museums) ও জাতিতাত্ত্বিক সমিতি (ethnological societies)। আমেরিকা ও ব্রিটেনসহ অন্যান্য পশ্চিমা দেশে বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক একটি জ্ঞানকান্ড হিসাবে নৃবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্ত থেকে শুরু করে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত। আমেরিকায় বোয়াস, ইংল্যান্ডে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন ও ম্যালিনোস্কি, এবং ফ্রান্সে দুর্খাইমের তত্ত্বাবধানে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নৃবিজ্ঞানীদের একটি নূতন প্রজন্ম গড়ে ওঠে, যারা শৌখিন জাতিতত্ত্ববিদদের হাত থেকে নৃবিজ্ঞান চর্চার কর্তৃত্ব নিয়ে নেন এবং বিবর্তনবাদের বিরোধিতা করে নৃবিজ্ঞান চর্চার নূতন তাত্ত্বিক কাঠামো ও পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। বোয়াস বিবর্তনবাদীদের তত্ত্ব ও পদ্ধতির সমালোচনা করেন, বিবর্তনবাদের পাল্টা হিসাবে ব্যাপ্তিবাদ (diffusionism) নামে পরিচিত যেসব তত্ত্ব প্রবর্তিত হয়েছিল, সেগুলিরও বিরোধিতা করেছিলেন ক্ষেত্র বিশেষে। বিভিন্ন সমাজের সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যকে ঢালাও কোন সাধারণীকরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে বোয়াস জোর দিয়েছিলেন একেকটা সংস্কৃতি সম্পর্কে যতটা সম্ভব বিস্তারিত বিবরণ সরেজমিনে সংগ্রহ করার উপর। অন্যদিকে ব্রিটেনে র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন ও ম্যালিনোস্কি বিবর্তনবাদকে অগ্রাহ্য বা বাতিল করেছিলেন 'ক্রিয়াবাদী' দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁরা মনে করতেন, সমাজ বা সংস্কৃতিকে বোঝার জন্য এর বিভিন্ন উপাদানের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে, তা জানার দরকার নেই, বরং এই উপাদানগুলো কিভাবে কাজ করে, পুরো ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে কোন্‌টার কি ভূমিকা, সেটাই হওয়া উচিত নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রধান লক্ষ্য। মার্কিন, ব্রিটিশ প্রভৃতি সংস্করণে বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক একটি জ্ঞানকান্ড হিসাবে আত্মপ্রকাশের পর বেশ দ্রুতগতিতেই পশ্চিমা দেশগুলোতে নৃবিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক প্রসার ঘটেছিল, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে পশ্চিমা বিশ্বের নৃবিজ্ঞান চর্চায় ব্যাপক রদবদল ঘটতে শুরু করে। ষাট ও সত্তরের দশকে নৃবিজ্ঞানের সকল ধারাতেই নূতন গবেষণাক্ষেত্র, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, নূতন তাত্ত্বিক কাঠামো, নূতন পদ্ধতির অন্বেষা লক্ষ্য করা গেছে। এভাবে নৃবিজ্ঞানে একধরনের খন্ডায়ন প্রক্রিয়া সূচিত হয়েছে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানকান্ড হিসাবে নৃবিজ্ঞানের আবির্ভাব ঘটেছে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে। সর্বপ্রথম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৫ সালে নৃবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর একে একে ঢাকা, শাহ জালাল (সিলেট), চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও নৃবিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়েছে এবং আরো দু'একটিতে খোলা হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন -

১। নৃবিজ্ঞানের উদ্ভবের ইতিহাস আলোচনায় কোন্ বিষয়টা সবচাইতে প্রাসঙ্গিক?
- ক. বিভিন্ন সংস্কৃতিতে মানুষের উৎপত্তি সংক্রান্ত যেসব কাহিনী চালু রয়েছে
- খ. মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে প্ল্যাটো ও অন্যান্য গ্রীক দার্শনিকদের চিন্তাভাবনা
- গ. বিগত কয়েক শতাব্দীতে ইউরোপের ইতিহাসে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন পরিবর্তন
- ঘ. ডারউইনের তত্ত্ব

২। এনলাইটেনমেন্টের ফলে
- ক. সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে, এই ধারণার অবসান ঘটেছিল
- খ. ইউরোপীয়রা প্রাচীন গ্রীকদের শিল্প-সাহিত্য-দর্শনের সাথে পরিচিত হয়েছিল
- গ. চিন্তাজগতে যুক্তি ও বিজ্ঞানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল
- ঘ. শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল

৩। সামাজিক সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারণা
- ক. ডারউইনের তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল
- খ. বিংশ শতাব্দীতে ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে
- গ. উনবিংশ শতাব্দীতে নৃবৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রধান ভিত্তি ছিল
- ঘ. মর্গান প্রবর্তন করেছিলেন

৪। ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকে অধ্যয়নের জন্য
- ক. সমাজের বিবর্তনের ইতিহাস জানা দরকার
- খ. সমাজের সকল মানুষের ক্রিয়াকলাপ বিস্তারিত জানা দরকার
- গ. সমাজের বিদ্যমান বিভিন্ন দ্বন্দ্ব সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক
- ঘ. সমাজের বিভিন্ন অংশ কি কি, কোন্‌টির কাজ কি, এগুলো জানা দরকার

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিকোণ কী?

২। উত্তর-আধুনিকতাবাদ (postmodernism) কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ইউরোপের ইতিহাসে বিগত পাঁচ শতাব্দীতে সংঘটিত বিভিন্ন পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে নৃবিজ্ঞানের উদ্ভব ব্যাখ্যা করুন।

২। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে একটি সমন্বিত জ্ঞানকান্ড হিসাবে নৃবিজ্ঞানের উদ্ভবের পেছনে বিবর্তনবাদের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৩। বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক একটি জ্ঞানকান্ড হিসাবে নৃবিজ্ঞানের বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করুন।

পাঠ - ৬

নৃবিজ্ঞান ও অন্যান্য জ্ঞানকান্ড
Anthropology and other Disciplines

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- নৃবিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য জ্ঞানকান্ডের পার্থক্য ও সম্পর্ক
- নৃবিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের ঐতিহ্যগত পার্থক্যসমূহ
- নৃবিজ্ঞানের সাথে ইতিহাসের সাম্প্রতিক যোগসূত্র
- নৃবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক
- নৃবিজ্ঞানের সাথে মানবিক শাস্ত্রসমূহের সম্পর্ক বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা

ভূমিকা

নৃবিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য জ্ঞানকান্ডের যোগসূত্র সম্পর্কে আগের পাঠগুলো থেকেই কিছুটা ধারণা আপনি পেয়েছেন। পৃথিবীর সকল স্থানের ও সকল কালের মানুষদের অধ্যয়নের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত জ্ঞানকান্ড হিসাবে নৃবিজ্ঞানকে সংগঠিত করার প্রয়াসে নৃবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন জ্ঞানকান্ড থেকে অনেক কিছু নিয়েছেন। দৈহিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানে প্রাগৈতাহিসক যুগের মানুষের জীবাশ্ম ও তাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসপত্রের বয়স নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত কৌশলগুলো এসেছে ভূতত্ত্ব, পদার্থবিজ্ঞান ও রসয়ানশাস্ত্র থেকে। প্রাগৈতাহিসক মানুষদের রেখে যাওয়া বিভিন্ন চিহ্নের সাথে প্রাপ্ত অন্যান্য জৈব নমুনা বিশ্লেষণের কাজে জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নেওয়া হয়। আর বলা বাহুল্য, মানব বিষয়ক যত ধরনের বিজ্ঞান আছে, তার প্রায় প্রতিটার সাথে নৃবিজ্ঞানের কোন না কোন যোগসূত্র রয়েছে। তবে মানব বিষয়ক অন্যান্য জ্ঞানকান্ডের সাথে নৃবিজ্ঞানের পার্থক্য হল এই যে, অন্যান্য জ্ঞানকান্ড যেখানে বিশেষ কোন দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের বিষয়বস্তুর সীমানা নির্ধারণ করে রেখেছে, সেখানে নৃবিজ্ঞানে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ সমন্বিত করার চেষ্টা করা হয়েছে, এবং বিষয়বস্তুর কোন সুনির্দিষ্ট সীমানা বেঁধে দেওয়া নেই।

মানব বিষয়ক অন্যান
জ্ঞানকান্ডের সাথে নৃ
পার্থক্য হল এই যে,
জ্ঞানকান্ড যেখানে বি
দৃষ্টিকোণ থেকে তাদে
বিষয়বস্তুর সীমানা নি
রেখেছে, সেখানে নৃবি
বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ সমা
চেষ্টা করা হয়েছে, এ
বিষয়বস্তুর কোন সুনি
সীমানা বেঁধে দেওয়া

বাস্তবে অবশ্য নৃবিজ্ঞানকে মানব বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান বলার দিন আর নেই। যেমন, আজকাল দৈহিক বা জৈবিক নৃবিজ্ঞানের সাথে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের সংযোগ খুবই ক্ষীণ হয়ে গেছে। অতীতে বিবর্তনের ধারণা বা 'আদিম সমাজ'-কেন্দ্রিক গবেষণা বিভিন্ন শাখার নৃবিজ্ঞানকে সমন্বিত করতে সহায়তা করেছিল, কিন্তু সে অবস্থা এখন আর দেখা যায় না। কাজেই নৃবিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য জ্ঞানকান্ডের সম্পর্ক আলোচনা করতে গেলে দেখতে হবে আমরা কোথাকার ও কবেকার কোন ধরনের নৃবিজ্ঞান নিয়ে কথা বলছি। এক্ষেত্রে আমরা মূলতঃ নজর দেব সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য জ্ঞানকান্ডের সম্পর্কের উপর। এ প্রসঙ্গে যে বিষয়টা মনে রাখা সুবিধাজনক হবে তা হল, নৃবিজ্ঞানের মতই অন্যান্য জ্ঞানকান্ডেও এসেছে অনেক পরিবর্তন। ফলে সাধারণভাবে বিভিন্ন জ্ঞানকান্ডের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখাগুলো অস্পষ্ট হয়ে গেছে। একই সাথে প্রথাগতভাবে চর্চিত বিভিন্ন জ্ঞানকান্ডের রূপান্তর ও মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে উঠছে নূতন নূতন নামে পরিচিত জ্ঞানকান্ড, যেগুলোকে সনাতনী কোন শ্রেণীকরণ অনুযায়ী সাজানো যায় না।

নৃবিজ্ঞানের সাথে অন
জ্ঞানকান্ডের সম্পর্ক
করতে গেলে দেখতে
আমরা কোথাকার ও
কোন ধরনের নৃবিজ্ঞা
কথা বলছি।

নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে তিনটি সুপরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানকান্ড হল সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান, যেগুলির সাথে ঐতিহ্যগতভাবে নৃবিজ্ঞানের পার্থক্য গড়ে উঠেছে এক ধরনের বিদ্যাজাগতিক শ্রমবিভাজনের ভিত্তিতে। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজকে মোটা দাগে ভাগ করার জন্য কিছু জোড় পদ ব্যবহার করা হয়, যেমন আদিম-আধুনিক, সরল-জটিল, অসাক্ষর-সাক্ষর, প্রাক-শিল্পযুগীয়-শিল্পায়িত ইত্যাদি। এগুলির দ্বিতীয় পদসমূহ দিয়ে নির্দেশিত সমাজগুলোর প্রতিই মূলতঃ সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নজর কেন্দ্রীভূত থেকেছে। অন্যদিকে নৃবিজ্ঞানে বেশী নজর দেওয়া হয়েছে উল্লিখিত তালিকার প্রথম পদগুলো দিয়ে চিহ্নিত সমাজগুলোর প্রতি। এছাড়া সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অধ্যয়নের মূল বিষয় হিসাবে যথাক্রমে সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতি ধারণা দিয়ে চিহ্নিত পৃথক পৃথক ক্ষেত্র বেছে নেওয়া হলেও নৃবিজ্ঞানে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়সমূহের কোন কোন একটি দিকের উপর আলাদা করে বেশী নজর দেওয়া হয় নি। মনে করা হয় যে, নৃবিজ্ঞানীরা ঐতিহ্যগতভাবে যে ধরনের সমাজ নিয়ে গবেষণা করতেন, সে ধরনের সমাজে এই বিষয়গুলোকে বাস্তবে সবসময় আলাদা করেও দেখা সম্ভব ছিল না।

কিছু উদাহরণ দিলেই নৃবিজ্ঞানের সাথে আলোচ্য অন্য তিনটি সামাজিক বিজ্ঞানের ঐতিহ্যগত পার্থক্যগুলো বোঝা যাবে।

নৃবিজ্ঞানীরা সমাজের সংগঠন দেখতে গিয়ে জ্ঞাতিসম্পর্ক, বিয়ে ও বংশধারার প্রতি প্রচুর মনোযোগ দিয়েছেন, কারণ সরল বা আদিম বলে বিবেচিত যে ধরনের সমাজ সম্পর্কে নৃবিজ্ঞানীরা প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভে সচেষ্ট ছিলেন, সে ধরনের সমাজের প্রেক্ষিতে এই বিষয়গুলোকে দেখা হয়েছে সমাজ কাঠামোর মূল ভিত্তি হিসাবে। এ ধরনের সমাজে বিত্ত, ক্ষমতা বা মর্যাদার তারতম্যের ভিত্তিতে প্রকট কোন সামাজিক অসমতা নৃবিজ্ঞানীরা দেখেন নি, ফলে সামাজিক স্তরবিন্যাস, শ্রেণী ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তাঁদের সচরাচর যেতে হয় নি। পক্ষান্তরে জ্ঞাতিসম্পর্কের মত বিষয়ের তুলনায় শেষোক্ত বিষয়াদি নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের অনেক বেশী মাথা ঘামাতে হয়েছে।

নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অপেক্ষাকৃত সরল ধরনের সমাজের প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক হিসাবে আলাদা করে শনাক্ত করা যায়, এমন কর্মকান্ড বা প্রতিষ্ঠানও বিরল। বরং জ্ঞাতিসম্পর্কের মত বিষয়ের সাথেই অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বিষয়াবলী ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে বলে মনে করা হয়। এ ধরনের সমাজে 'বাজার ব্যবস্থা' বলে কিছু ছিল না বা থাকলেও সেটাই অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল নির্ধারক ছিল না। ফলে যেখানে অর্থনীতিবিদরা ব্যস্ত থেকেছেন বাজার ব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি বোঝার কাজে, সেখানে নৃবিজ্ঞানীদের অনেকে দেখতে চেয়েছেন বাজার ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে বা এর বাইরে বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কের সূত্র ধরে কিভাবে অর্থনৈতিক লেনদেন সম্পন্ন হয়। একইভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের নজরের কেন্দ্রবিন্দু রাষ্ট্র (লক্ষ্যণীয় যে, Political Science-এর বাংলা করা হয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, যেনবা রাজনৈতিক কর্মকান্ড একমাত্র রাষ্ট্রকে ঘিরেই সংঘটিত হয়), সেখানে নৃবিজ্ঞানীরা এমন সমাজের কথা বলেন যাদের মধ্যে রাষ্ট্রব্যবস্থা বা ক্ষমতার কোন কেন্দ্রীভূত রূপ ছিল না। এ ধরনের ক্ষেত্রে ক্ষমতা বা রাজনীতি বলতে কি বোঝায়? এসব প্রশ্নের উত্তর নৃবিজ্ঞানীরা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

য়বস্তু ও গবেষণাক্ষেত্র বা গবেষণাকৌশলের ক থেকে এখন অনেক ীই অন্যান্য সামাজিক ীদের মত করেই কাজ এর উল্টোটাও সত্য।

পদ্ধতিগতভাবে অপেক্ষাকৃত সরল ধরনের সমাজ অধ্যয়নের জন্য নৃবিজ্ঞানীরা মূলতঃ নির্ভর করেছেন এধরনের সমাজে দীর্ঘদিন বাস করে তাদের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের উপর। পক্ষান্তরে বৃহদায়তনের জটিল সমাজ অধ্যয়নের জন্য অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানে জরীপ, প্রশ্নমালা, পরিসংখ্যান প্রভৃতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। নৃবিজ্ঞানীরা ক্ষুদ্র পরিসরে নিবিড় অধ্যয়নের উপর মনোনিবেশ

করতে গিয়ে গুণগত উপাত্তের উপর বেশী জোর দিয়েছেন, অন্যদিকে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানীরা বৃহৎ পরিসরে প্রচুর পরিমাণ পরিমাপযোগ্য উপাত্ত সংগ্রহের উপর জোর দিয়েছেন।

উপরে আলোচিত পার্থক্যগুলো অবশ্য মোটা দাগের, যেগুলো সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে আর ততটা প্রযোজ্য নয়। বিষয়বস্তু ও গবেষণাক্ষেত্র নির্বাচন বা গবেষণাকৌশলের দিক থেকে এখন অনেক নৃবিজ্ঞানীই অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানীদের মত করেই কাজ করছেন। এর উল্টোটাও সত্য। সমাজবিজ্ঞানীরাও অনেকে নৃবৈজ্ঞানিক ধাঁচে ক্ষুদ্র পরিসরে নিবিড় মাঠকর্ম করেছেন। এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরাও সবাই এখন আর রাজনীতি অধ্যয়নের জন্য রাষ্ট্রের উপর নজর কেন্দ্রীভূত রাখে না। এদিক থেকে অর্থনীতি বা রাজনীতি অধ্যয়নের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করে তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী সংযোজনে নৃবিজ্ঞানীরাও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

নৃবিজ্ঞান ও ইতিহাস

ইতিহাস বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝে থাকি অতীতের ঘটনাবলীর বিবরণ। স্কুল পর্যায়ে ইতিহাস পড়তে গিয়ে আপনাকে নিশ্চয় বিভিন্ন রাজা-বাদশাহদের নাম ও সন তারিখ মুখস্থ করতে হয়েছে, জানতে হয়েছে বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী সম্পর্কে। এও আপনি ইতোমধ্যে জেনেছেন যে উনবিংশ শতাব্দীতে নৃবিজ্ঞানীরাও মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিহাস জানতে আগ্রহী ছিলেন। ইতিহাসবিদদের সাথে এক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানীদের মূল পার্থক্য হল, নৃবিজ্ঞানীরা যে ধরনের ইতিহাসের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন, সেখানে হাজার হাজার বা লক্ষাধিক বছরের প্রক্রিয়াগুলো সম্পর্কে সাধারণভাবে জানতে চাওয়া হয়েছে, যেখানে সুনির্দিষ্ট কোন দিন তারিখ নাম জানার উপায় বা প্রয়োজন কোনটাই ছিল না। নানান কারণে অবশ্য এ ধরনের বিবর্তনের ইতিহাস অনুসন্ধান থেকে নৃবিজ্ঞানীরা সরে এসেছিলেন বিংশ শতাব্দীর গোড়া নাগাদ, এবং মনোনিবেশ করেছিলেন বিভিন্ন 'অসাক্ষর' (non-literate) সমাজ নৃবিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ কালে কি অবস্থায় ছিল, তা জানার উপর। এ ধরনের সমাজে যেহেতু প্রচলিত অর্থে কোন ঐতিহাসিক দলিলপত্র ছিল না, ইতিহাসবিদরা সচরাচর তাদের প্রতি কোন মনোযোগ দেখান নি, এবং দীর্ঘদিন যাবত অধিকাংশ নৃবিজ্ঞানীও মনে করেছেন যে তাঁদের গবেষণায় ইতিহাস বিষয়টা ততটা প্রাসঙ্গিক ছিল না।

বিগত দুই তিন দশকের মধ্যে অবশ্য নৃবিজ্ঞান ও ইতিহাসের মধ্যে নূতন নূতন যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। নৃবিজ্ঞানীরা ক্রমশঃ উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, যে ধরনের সমাজগুলো নিয়ে তাঁরা সচরাচর গবেষণা করেছেন, সেগুলিকে ইতিহাসবিহীন বা ইতিহাস-বহির্ভূত হিসাবে দেখার পেছনে কোন যুক্তি ছিল না। ফলে নৃবিজ্ঞানীরা যেখানে অতীতে ক্ষুদ্র আয়তনের এক একটা সমাজকে এক একটা দ্বীপের মত করে দেখেছেন, সেখানে এখন চেষ্টা চলছে এ ধরনের সমাজকে ঔপনিবেশিকতাসহ বৃহত্তর পরিসরে ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে নূতন করে জানার। তাছাড়া এ ধরনের সমাজের সদস্যরা ইতিহাসকে কিভাবে দেখে, ইতিহাসে তাদের ভূমিকা কি, এ জাতীয় বিষয়ও এখন নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিয়েছে। অন্যদিকে প্রথাগত ইতিহাস চর্চায়ও নৃবিজ্ঞানের কিছু কিছু ঐতিহ্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রাজা-বাদশা কেন্দ্রিক ইতিহাস অধ্যয়ন থেকে সরে এসে অনেক ইতিহাসবিদ সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস অধ্যয়নে মনোযোগী হয়েছেন। সাধারণ মানুষ বা প্রথাগত ইতিহাসে উপেক্ষিত কৃষক, নারী, আদিবাসী প্রভৃতি 'নিম্নবর্গের' মানুষদের ইতিহাস অনুসন্ধানের গুরুত্ব ক্রমশঃ ব্যাপক স্বীকৃতি পাচ্ছে। নৃবিজ্ঞানীরা যেমন তাঁদের গবেষণায় মৌখিক উৎস থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যকে গুরুত্ব দেন, তেমনি অনেক ইতিহাসবিদও এখন মৌখিক ইতিহাসকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। নৃবিজ্ঞানের সংস্কৃতির ধারণা, স্থানিক প্রেক্ষাপটকে গুরুত্ব দেওয়ার ঐতিহ্য প্রভৃতিও অনেক ইতিহাসবিদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে নৃবিজ্ঞান ও ইতিহাসের মিথস্ক্রিয়ায় জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কিছু নূতন ধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী সংযোজিত হয়েছে।

বিগত দুই তিন দশকে অবশ্য নৃবিজ্ঞান ও ই মধ্যে নূতন নূতন যো স্থাপিত হয়েছে।

নৃবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান

মনোবিজ্ঞানে ব্যক্তির মনোজাগতিক কাঠামো, ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি বিষয় অধ্যয়ন করা হয়। তবে শিল্পায়িত পশ্চিমা সমাজের প্রেক্ষিতে, যেখানে মনোবিজ্ঞানের সূচনা, ব্যক্তির মনোজাগতিক প্রবণতা ও 'ব্যক্তিত্ব' বিকাশের প্রক্রিয়া সম্পর্কে যেসব অনুমান প্রচলিত, সেগুলো সব ধরনের সমাজে প্রযোজ্য কিনা, এ প্রশ্ন থেকে যায়। নৃবিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে অপশ্চিমা সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে অনুসন্ধান চালিয়েছেন। আমেরিকায় 'সংস্কৃতি ও ব্যক্তিত্ব' অধ্যয়নের একটি ধারা চালু ছিল সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের আওতায়। এ ধারার আর একজন বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী ছিলেন মার্গারেট মীড, যিনি তাঁর *Coming of Age in Samoa* (১৯২৮) গ্রন্থে দেখাতে চেয়েছিলেন যে, মার্কিন প্রেক্ষাপটে বয়োসন্ধিকালে যে ধরনের মনস্তাত্ত্বিক সংকট দেখা যায়, তা আসলে সাংস্কৃতিকভাবে নির্ধারিত, বাড়ন্ত কিশোর-কিশোরীদের দৈহিক পরিবর্তনের কোন প্রত্যক্ষ বা অনিবার্য ফলাফল নয়। তাঁর পর্যবেক্ষণ অনুসারে সামোয়াতে কৈশোর ছিল অপেক্ষাকৃত একটি সহজ সময়, যা মার্কিন দৃষ্টান্তের বিপরীত। একই ধারার অন্য একজন নৃবিজ্ঞানী রুথ বেনেডিক্ট তাঁর *Patterns of Culture* (১৯৩৪) নামক গ্রন্থে এই বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন যে, সমাজভেদে সমাজের সদস্যদের 'ব্যক্তিত্ব' দু'একটি প্রধান সাংস্কৃতিক ছাঁচ অনুযায়ী গড়ে ওঠে। যেমন, তাঁর মতে, উত্তর আমেরিকার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকূল এলাকায় বসবাসরত কোয়াকিউটল জনগোষ্ঠীর মধ্যে সবক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করার প্রবণতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য ছিল। পক্ষান্তরে আদিবাসী জুনিদের মধ্যে দেখা যেত শান্ত-সৌম্য বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। একই ধারায় পরবর্তীতে জাপানী, রুশ প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর 'জাতীয় চরিত্র' অধ্যয়নের চেষ্টা করা হয়েছিল, যেখানে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল কিভাবে একেকটা সমাজে প্রচলিত শিশু-পরিচর্যার ধরন বিশেষ ধরনের 'জাতীয় চরিত্র' গড়ে তোলে। প্রশ্নসাপেক্ষ পদ্ধতিতে পরিচালিত এ ধরনের গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ ছিল, কাজেই আজকাল অনুরূপ গবেষণা তেমন একটা হয় না।

য়িত পশ্চিমা সমাজের প্রেক্ষিতে, যেখানে জ্ঞানের সূচনা, ব্যক্তির নোজাগতিক প্রবণতা ও ক্তিত্ব' বিকাশের প্রক্রিয়া যসব অনুমান প্রচলিত, লা সব ধরনের সমাজে য কিনা, এ প্রশ্ন থেকে নৃবিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে অনুসন্ধান চালিয়েছেন।

মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াবলীর তুলনামূলক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী ম্যালিনোস্কিও কিছু অবদান রেখেছিলেন। তাঁর গবেষণায় একটা বহুল-পরিচিত ফ্রয়েডীয় ধারণার সীমাবদ্ধতা তুলে ধরা হয়েছিল। ফ্রয়েডের মতে পুরুষ শিশুরা বেড়ে ওঠার এক পর্যায়ে মাকে একান্ত নিজের করে পেতে চায় এবং পিতাকে প্রতিপক্ষ ভাবতে শুরু করে, যা 'ইডিপাস কমপ্লেক্স' (Oedipus complex) নামে অভিহিত। কিন্তু ম্যালিনোস্কিও ট্রবিরিয়ান্ড দ্বীপপুঞ্জে সম্পাদিত তাঁর মাঠকর্মের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলেন যে, সেখানে এ ধরনের কোন প্রবণতা ছিল না। ট্রব্রিরিয়ান্ডবাসীদের সমাজ ব্যবস্থা অনুযায়ী মেয়েরা বিয়ের পরেও স্বগৃহেই অবস্থান করত, যেখানে তাদের সন্তানরা বাস করত ও বেড়ে উঠত। 'বাবা'র পরিবর্তে শিশুদের তত্ত্বাবধান ও শাসনের দায়িত্ব বর্তাত 'মামা'দের উপর। ফলে এ সমাজে 'মামা-ভাগ্নে' সম্পর্কটা মোটেও মধুর হাসি ঠাট্টার ছিল না। পক্ষান্তরে পিতা-পুত্র সম্পর্কটা ছিল অনেক সহজ, যাতে 'ইডিপাস কমপ্লেক্স' ছিল অনুপস্থিত। স্পষ্টতই, সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীদের এ ধরনের গবেষণা মনোবৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণাসমূহকে বিভিন্ন ধরনের সমাজের প্রেক্ষিতে তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করার একটি প্রয়োজনীয় ভিত্তি রচনা করেছে।

নৃবিজ্ঞান ও মানবিক শাস্ত্রসমূহ (Humanities)

উপরে উল্লিখিত জ্ঞানকান্ডসমূহ ছাড়াও অন্যান্য জ্ঞানকান্ডের সাথেও নৃবিজ্ঞানের বহুমাত্রিক সম্পর্ক রয়েছে। যেমন, 'মানবিক' শাস্ত্র বলে যেগুলো পরিচিত, চারুকলা, সাহিত্য, নাট্যতত্ত্ব ইত্যাদি, সেগুলোর সাথেও নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন যোগসূত্র দেখা গেছে। অতীতে নৃবিজ্ঞানীরা তথাকথিত আদিম সংস্কৃতিসমূহের প্রেক্ষিতে এ সমস্ত বিষয়ে তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী জুগিয়েছেন। সংস্কৃতির যে বিস্তৃততর সংজ্ঞা নৃবিজ্ঞানীরা ব্যবহার করেছেন, তা শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত-নৃত্য-নাটক প্রভৃতি বিষয়কে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেখতে সহায়তা

তির সামগ্রিক রূপ যে সকল ধরনের মানুষের ক জীবনযাত্রার মধ্যেই রয়েছে, নৃবিজ্ঞানীদের এই দৃষ্টিভঙ্গী মানবিক হের চর্চায় নূতন মাত্রা রতে সহায়তা করেছে।

করেছে। অর্থাৎ শুধু এসব বিষয় নিয়েই যে সংস্কৃতি নয়, বরং সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপ যে সমাজের সকল ধরনের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার মধ্যেই নিহিত রয়েছে, নৃবিজ্ঞানীদের এই দৃষ্টিভঙ্গী নিঃসন্দেহে মানবিক শাস্ত্রসমূহের চর্চায় নূতন মাত্রা যোগ করতে সহায়তা করেছে।

অন্যদিকে শিল্প-সাহিত্যের জগতে উত্তর-আধুনিকতাবাদের যে ঢেউ সাম্প্রতিক দশকগুলোতে উঠেছে, তা নৃবিজ্ঞানেও এসে লেগেছে। যেমন, সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন সমকালীন তত্ত্ব ও পদ্ধতি ব্যবহার করে নৃবিজ্ঞানের অনেক ধ্রুপদী গ্রন্থকে এখন 'বিনির্মাণ' (deconstruct) করা হচ্ছে। নৃবিজ্ঞানীরা যে সব এথনোগ্রাফি রচনা করেছেন, সেগুলোকে এক একটা সংস্কৃতির বিবরণ হিসাবে গণ্য করা হত। কিন্তু এরকম কোন বিবরণই কখনও পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। কাজেই সংস্কৃতির লিখিত বিবরণ তুলে ধরার ক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানীরা কোন্ উদ্দেশ্যে কি ধরনের রচনাশৈলী অনুসরণ করেছেন, কতটুকু তাঁরা তুলে ধরেছেন এবং কেন, কি তাঁরা তুলে ধরেন নি, কোন্ ধরনের পাঠকের জন্য তাঁরা এসব গ্রন্থ রচনা করেছেন, ইত্যাদি প্রশ্নের আলোকে নৃবৈজ্ঞানিক সাহিত্যের পুনঃপরীক্ষণের কাজ চলছে।

অন্য সকল জ্ঞানকাণ্ডে
নৃবিজ্ঞান চর্চার বিভিন্ন
বিভিন্ন পরিবর্তনের ম
চলছে। এক্ষেত্রে কখ
নৃবিজ্ঞান অন্যান্য জ্ঞান
প্রভাবিত হয়েছে, আ
অন্যান্য জ্ঞানকাণ্ডকে
প্রভাবিত।

স্পষ্টতই, নৃবিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য জ্ঞানকান্ডের বহুমাত্রিক সম্পর্ক রয়েছে, যার অংশবিশেষ মাত্র উপরে আলোচনা করা হল। অন্য সকল জ্ঞানকান্ডের মতই নৃবিজ্ঞান চর্চার বিভিন্ন ধারাও বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলছে। এক্ষেত্রে কখনো নৃবিজ্ঞান অন্যান্য জ্ঞানকান্ড দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, আবার কখনো অন্যান্য জ্ঞানকান্ডকে করেছে প্রভাবিত।

সারাংশ

সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে তিনটি সুপরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানকান্ড হল সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান, যেগুলির সাথে ঐতিহ্যগতভাবে নৃবিজ্ঞানের পার্থক্য গড়ে উঠেছে এক ধরনের বিদ্যাজাগতিক শ্রমবিভাজনের ভিত্তিতে। নৃবিজ্ঞানীরা সমাজের সংগঠন দেখতে গিয়ে জ্ঞাতিসম্পর্ক, বিয়ে ও বংশধারার প্রতি প্রচুর মনোযোগ দিয়েছেন, কারণ সরল বা আদিম বলে বিবেচিত যে ধরনের সমাজ সম্পর্কে নৃবিজ্ঞানীরা প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভে সচেষ্ট ছিলেন। এ ধরনের সমাজে বিত্ত, ক্ষমতা বা মর্যাদার তারতম্যের ভিত্তিতে প্রকট কোন সামাজিক অসমতা নৃবিজ্ঞানীরা দেখেন নি, ফলে সামাজিক স্তরবিন্যাস, শ্রেণী ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তাঁদের সচরাচর যেতে হয় নি। পক্ষান্তরে জ্ঞাতিসম্পর্কের মত বিষয়ের তুলনায় শেষোক্ত বিষয়াদি নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের অনেক বেশী মাথা ঘামাতে হয়েছে। নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অপেক্ষাকৃত সরল ধরনের সমাজের প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক হিসাবে আলাদা করে শনাক্ত করা যায়, এমন কর্মকান্ড বা প্রতিষ্ঠানও বিরল। এ ধরনের সমাজে 'বাজার ব্যবস্থা' বলে কিছু ছিল না বা থাকলেও সেটাই অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল নির্ধারক ছিল না। ফলে যেখানে অর্থনীতিবিদরা ব্যস্ত থেকেছেন বাজার ব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি বোঝার কাজে, সেখানে নৃবিজ্ঞানীদের অনেকে দেখতে চেয়েছেন বাজার ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে বা এর বাইরে বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কের সূত্র ধরে কিভাবে অর্থনৈতিক লেনদেন সম্পন্ন হয়। একইভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের নজরের কেন্দ্রবিন্দু রাষ্ট্র। একইভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের নজরের কেন্দ্রবিন্দু রাষ্ট্র, সেখানে নৃবিজ্ঞানীরা এমন সমাজের কথা বলেন যাদের মধ্যে রাষ্ট্রব্যবস্থা বা ক্ষমতার কোন কেন্দ্রীভূত রূপ ছিল না। বিগত দুই তিন দশকের মধ্যে অবশ্য নৃবিজ্ঞান ও ইতিহাসের মধ্যে নূতন নূতন যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। নৃবিজ্ঞানীরা ক্রমশঃ উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, যে ধরনের সমাজগুলো নিয়ে তাঁরা সচরাচর গবেষণা করেছেন, সেগুলিকে ইতিহাসবিহীন বা ইতিহাস-বহির্ভূত হিসাবে দেখার পেছনে কোন যুক্তি ছিল না। নৃবিজ্ঞানের সংস্কৃতির ধারণা, স্থানিক প্রেক্ষাপটকে গুরুত্ব দেওয়ার ঐতিহ্য প্রভৃতিও অনেক ইতিহাসবিদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন -

১। নৃবিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য জ্ঞানকান্ডের সম্পর্ক আলোচনার ক্ষেত্রে কোন্ বক্তব্যটি যুক্তিযুক্ত?
   ক. নৃবিজ্ঞান একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান, অন্যান্য জ্ঞানকান্ড থেকে এর নেওয়ার কিছু নেই
   খ. নৃবিজ্ঞান অন্যান্য জ্ঞানকান্ড থেকে অনেক কিছু নিয়েছে, কিন্তু অন্যান্য জ্ঞানকান্ড নৃবিজ্ঞান থেকে কিছু নেয় নি
   গ. নৃবিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য জ্ঞানকান্ডের বহুমাত্রিক যোগসূত্র রয়েছে, যেগুলো সময়ের সাথে সাথে পাল্টে চলেছে
   ঘ. নৃবিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য জ্ঞানকান্ডের পার্থক্যের সীমারেখাগুলো ক্রমশ আরো স্পষ্ট হচ্ছে

২। সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে নীচের কোন্গুলির সাথে নৃবিজ্ঞানের সম্পর্ক রয়েছে?
   ক. সমাজ বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাথে
   খ. খ. সমাজ বিজ্ঞান ও অর্থনীতির সাথে
   গ. শুধু সমাজ বিজ্ঞানের সাথে
   ঘ. ঘ. সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রতিটার সাথেই কমবেশী সম্পর্ক রয়েছে

৩। সাম্প্রতিক কালে নৃবিজ্ঞানের সাথে ইতিহাসের সম্পর্ক ---------- ।
   ক. কমে গেছে; খ. ছিন্ন হয়ে গেছে
   গ. বিভিন্ন দিক থেকে বেড়েছে; ঘ. অতীতের মতই রয়েছে

৪। মার্কিন নৃবিজ্ঞানের 'সংস্কৃতি ও ব্যক্তিত্ব' অধ্যয়নের ধারায় কি ধরনের বিষয়ের উপর নজর দেওয়া হয়েছে?
   ক. সংস্কৃতির উন্নয়নে বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের অবদান
   খ. সমাজের সদস্যদের ব্যক্তিত্বের পার্থক্য কিভাবে সংস্কৃতির উপর প্রভাব ফেলে
   গ. কোন্ সংস্কৃতি কি ধরনের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হতে দেয়
   ঘ. উপরের কোনটিই না

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বিগত দুই-তিন দশকের মধ্যে নৃবিজ্ঞান ও ইতিহাসের মধ্যে কি কি যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে?
২। সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্রসমূহ কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। 'নৃবিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য জ্ঞানকান্ডের সম্পর্ক আলোচনা করতে গেলে দেখতে হবে আমরা কোথাকার ও কবেকার কোন ধরনের নৃবিজ্ঞান নিয়ে কথা বলছি' - ব্যাখ্যা করুন
২। বিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান সমূহের ঐতিহ্যগত পার্থক্যের উপর আলোকপাত করুন
৩। বিজ্ঞানীদের সাথে ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান ও অন্যান্য মানবিক শাস্ত্রের সম্পর্ক আলোচনা করুন

পাঠ - ৭

সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে গবেষণা পদ্ধতি
Research Methods in Cultural Anthropology

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে মাঠকর্মের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য
- সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে তুলনামূলক পদ্ধতির ব্যবহার
- সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে জরীপ ও ঐতিহাসিক গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা
- সামাজিক গবেষণার রাজনৈতিক ও নৈতিক দিক

প্রতিটা জ্ঞানকান্ডেই নির্দিষ্ট কিছু গবেষণা পদ্ধতি রয়েছে। ভৌত ও জৈবিক বিজ্ঞানসমূহে ল্যাবরেটরি বা গবেষণাগারে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। তবে সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি (experimental method) প্রয়োগের কোন সুযোগ নেই। দুটো রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে কি ধরনের বিক্রিয়া ঘটে, বা কোন আণুবীক্ষণিক প্রাণী সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন কতটা তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে, এ জাতীয় বিষয় গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব, কিন্তু একজন সামাজিক বিজ্ঞানীর পক্ষে মানব সমাজের উপর অনুরূপ কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো ব্যবহারিক দিক থেকে যেমন সমস্যাজনক, তেমনি নৈতিকভাবেও প্রশ্নসাপেক্ষ। কাজেই সামাজিক বিজ্ঞানসমূহে গবেষণা বলতে সাধারণত কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা বোঝায় না। বিশেষ কোন প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য, বা কোন তত্ত্বের নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য সামাজিক বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ, জরীপ প্রভৃতি বিভিন্ন পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে থাকেন। অধ্যয়নের বিষয় ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুসারে প্রতিটা জ্ঞানকান্ডে বিশেষ কিছু পদ্ধতির বিকাশ ঘটেছে। এক্ষেত্রে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানেরও রয়েছে নিজস্ব কিছু গবেষণা পদ্ধতি, যেগুলোর মধ্যে এথনোগ্রাফিক মাঠকর্ম ও তুলনামূলক পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য।

অধ্যয়নের বিষয় ও ল উদ্দেশ্য অনুসারে প্রতি জ্ঞানকান্ডে বিশেষ কি বিকাশ ঘটেছে। এক্ষে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানেরও রয়েছে কিছু গবেষণা পদ্ধতি, মধ্যে এথনোগ্রাফিক তুলনামূলক পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য।

মাঠকর্ম

সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে 'মাঠ' বলতে বোঝায় এমন কোন স্থান বা এলাকা যেখানে গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেখানে বসবাসরত মানুষদের কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করার এবং তাদের সাথে মেশার, কথা বলার সুযোগ রয়েছে। এভাবে পর্যবেক্ষণ ও কথোপকথন, সাক্ষাতকার প্রভৃতি কৌশল ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিকে মাঠকর্ম বা মাঠ গবেষণা বলা হয়। ঐতিহ্যগতভাবে অধিকাংশ সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীই মাঠকর্ম সম্পাদন করেছেন প্রযুক্তি বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের বিচারে অপেক্ষাকৃত সরল ধরনের সমাজসমূহের মধ্যে। এই ঐতিহ্য অনুযায়ী নৃবিজ্ঞানীরা যখন মাঠ গবেষণার মাধ্যমে ক্ষুদ্র কোন সম্প্রদায়ের সার্বিক জীবনযাত্রা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করেন, তখন সেটাকে বলা হয় 'এথনোগ্রাফিক মাঠকর্ম'। পোলিশ বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী ম্যালিনোস্কি ট্রব্রিরিয়ান্ড দ্বীপপুঞ্জে সম্পাদিত তাঁর মাঠকর্মের ভিত্তিতে রচিত এথনোগ্রাফিক গ্রন্থ *Argonauts of the Western Pacific*-এর শুরুতে নৃবৈজ্ঞানিক মাঠকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি, কিভাবে সেগুলো অর্জন করা যায়, এসব বিষয়ে যে আলোচনা করেছিলেন, তা নৃবিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসাবে বিবেচিত। উক্ত আলোচনায় ম্যালিনোস্কি এথনোগ্রাফিক মাঠকর্মের একটি মানদন্ড নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন: *কোন জনগোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থা বা সংস্কৃতিকে জানার জন্য তাদের মাঝে কমপক্ষে একবছর থেকে, তাদের ভাষা শিখে, তাদের সাথে মিশে, 'স্থানীয়দের চোখ দিয়ে' ঐ সমাজ ও সংস্কৃতিকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে।*

ম্যালিনোস্কি এথনোগ্র মাঠকর্মের একটি মান নির্ধারণ করে দিয়েছি কোন জনগোষ্ঠীর সম বা সংস্কৃতিকে জানার তাদের মাঝে কমপক্ষে থেকে, তাদের ভাষা তাদের সাথে মিশে, চোখ দিয়ে' ঐ সমাজ সংস্কৃতিকে বোঝার চে

ষণা এলাকায় দীর্ঘদিন সেখানকার মানুষদের থ মিশে তথ্য সংগ্রহের শলকে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ বলা হয়।

এথনোগ্রাফিক মাঠকর্মে গবেষণা এলাকায় দীর্ঘদিন থেকে সেখানকার মানুষদের সাথে মিশে তথ্য সংগ্রহের কৌশলকে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ বলা হয় (participant observation: অন্যভাবেও এর বাংলা করা হয়েছে)। নৃবিজ্ঞানীরা গবেষণা এলাকায় অবস্থান নেওয়ার পর থেকে দৈনন্দিন বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ সযত্নে টুকে রাখতে শুরু করেন, যেগুলো (field notes) চূড়ান্ত কোন প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে প্রধান ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। একজন বহিরাগতকে স্থানীয় মানুষরা সহজে আপন করে নেবে, এমন কোন কারণ নেই। কিভাবে স্থানীয় মানুষদের আস্থা অর্জন করা যাবে, তার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। গবেষণা এলাকায় পৌঁছে প্রত্যেক নৃবিজ্ঞানী তাঁর সাধ্যমত চেষ্টা করেন তাঁর উপস্থিতিকে যতটা সম্ভব স্থানীয় মানুষদের কাছে বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে, তাদের সাথে সুসম্পর্ক (rapport) তৈরী করতে। শুরুতে নৃবিজ্ঞানীদের সচরাচর বেগ পেতে হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা সাংস্কৃতিক পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে, অনেকেই মুখোমুখি হন এক ধরনের 'সাংস্কৃতিক ধাক্কা'র (culture shock)। প্রাথমিক এসব সমস্যা কাটিয়ে উঠে নৃবিজ্ঞানী চেষ্টা করেন স্থানীয় জীবনযাত্রার সাথে মানিয়ে নিতে। একটা পর্যায়ে স্থানীয় মানুষরাও হয়ত তাঁকে অনেকটা আপন করে নেয়, বা অন্ততঃ তাঁর উপস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এভাবে ধীরে ধীরে নৃবিজ্ঞানী গবেষণা এলাকার মানুষদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে স্থানীয় সমাজ ও সংস্কৃতিকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করেন। এথনোগ্রাফিক মাঠকর্মে নৃবিজ্ঞানীরা সচরাচর কমপক্ষে একবছর গবেষণা এলাকায় থাকার চেষ্টা করতেন, যাতে ঋতুচক্রের একটা পূর্ণ আবর্তনের প্রেক্ষিতে স্থানীয় মানুষদের জীবনযাত্রার ছন্দের পরিবর্তনগুলো তাঁরা পর্যাপ্তভাবে দেখার সুযোগ পান।

গ্রহণকারী পর্যবেক্ষণে নীরা স্থানীয় মানুষদের সাথে কথোপকথন ও রিতার মাধ্যমে অনেক ংগ্রহ করেন। বাঁধাধরা শ্নের তালিকা মাথায় না পাশে যখন যা ঘটছে, নুযায়ী নিয়মিত অনেক রা জানতে চান। তবে য়োজনানুসারে নির্দিষ্ট মালার ভিত্তিতে বিভিন্ন ক্ষাতকারও গ্রহণ করা হয়।

অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণে নৃবিজ্ঞানীরা স্থানীয় মানুষদের সাথে কথোপকথন ও আলাপচারিতার মাধ্যমে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। বাঁধাধরা কোন প্রশ্নের তালিকা মাথায় না রেখে চারপাশে যখন যা ঘটছে, সে অনুযায়ী নিয়মিত অনেক বিষয়ে তাঁরা জানতে চান। তবে প্রয়োজনানুসারে নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষাতকারও গ্রহণ করা হয়। মাঠকর্ম করতে গিয়ে অনেক নৃবিজ্ঞানীই স্থানীয় মানুষদের মধ্যে এমন দু'একজন ব্যক্তির সন্ধান করেন যাঁরা গবেষণা-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য ও ব্যাখ্যা দিয়ে বিশেষভাবে সহায়তা করতে পারেন। যেমন, কোন প্রবীণ ব্যক্তি হয়ত ভাল বলতে পারেন কার সাথে কে কি ধরনের জ্ঞাতিসম্পর্কের সূত্রে আবদ্ধ। অথবা, ধর্মীয় আচার-বিশ্বাস সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল ব্যাখ্যা দিতে পারেন এমন কোন স্থানীয় বিশেষজ্ঞ হয়ত রয়েছেন। মাঠকর্ম চলাকালে এ ধরনের ব্যক্তিরা নৃবিজ্ঞানীদের জন্য হয়ে উঠতে পারেন প্রধান তথ্যদাতা (key informant)। এছাড়া স্থানীয় মানুষদের কারো কারো বিস্তারিত জীবন ইতিহাসও (life history) নৃবিজ্ঞানীরা সংগ্রহ করতে পারেন। সংগৃহীত জীবন ইতিহাস হতে পারে এমন কোন ব্যক্তির, যাঁকে হয়ত সমাজের একজন গড়পড়তা (typical) সদস্য হিসাবে দেখা যায়, অথবা তিনি হতে পারেন স্থানীয় প্রেক্ষাপটে ব্যতিক্রমধর্মী কোন ব্যক্তি। উভয় ক্ষেত্রেই লক্ষ্য থাকে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে, তার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, স্থানীয় সমাজ ও সংস্কৃতির উপর আলোকপাত করা। এভাবে তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন কৌশলের সমন্বয়ে এথনোগ্রাফিক মাঠকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে নৃবিজ্ঞানীরা ক্ষুদ্রায়তনের কোন সমাজ বা বৃহদায়তনের কোন সমাজের ক্ষুদ্র কোন অংশ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তৈরী করেন।

আন্তঃসাংস্কৃতিক তুলনা তিক নৃবিজ্ঞানের একটি গবেষণা পদ্ধতি। মানব বিশেষ কোন দিক ভিন্ন ন্ন সংস্কৃতিতে কি রূপে ন ও ক্রিয়াশীল থাকে, বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে ন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান ক প্রাপ্ত এথনোগ্রাফিক তথ্যের আলোকে।

তুলনামূলক পদ্ধতি

আন্তঃসাংস্কৃতিক তুলনা (cross-cultural comparison) সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের একটি অন্যতম গবেষণা পদ্ধতি। মানব জীবনের বিশেষ কোন দিক ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিতে কি রূপে বিরাজমান ও ক্রিয়াশীল থাকে, তা নৃবিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত এথনোগ্রাফিক তথ্যের আলোকে। যেমন, নারী-পুরুষের সম্পর্ক সকল সমাজেই অসম কিনা, বা এই অসমতার মাত্রায় কতটা তারতম্য দেখা

যায়, কি কি বিষয়ের আলোকে সেই তারতম্য ব্যাখ্যা করা সম্ভব, এ ধরনের কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে লিঙ্গীয় সম্পর্কের বিবিধ সাংস্কৃতিক রূপের তুলনামূলক বিশ্লেষণ আবশ্যক হয়ে ওঠে। পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্ক থেকে শুরু করে অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম বিভিন্ন বিষয়ে এ ধরনের তুলনামূলক পাঠ সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

জরীপ

বৃহদায়তনের কোন সমাজে গবেষণা করতে গেলে সামাজিক বিজ্ঞানীরা প্রায়ই জরীপের সাহায্য নিয়ে থাকেন। বিশাল কোন জনগোষ্ঠীর উপর গবেষণা করতে গেলে সমাজের সকল সদস্যের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়, ফলে চেষ্টা করা হয় পরিসংখ্যানবিদ্যার বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে পর্যাপ্ত সংখ্যক কিছু তথ্যদাতা নির্বাচন করতে, যাদেরকে সমাজের বিশেষ কোন গোষ্ঠী, শ্রেণী বা অন্য কোন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত কোন বর্গের জন্য প্রতিনিধিত্বশীল বলে গণ্য করা যেতে পারে। ধারণাটা অনেকটা এরকম, কোন পুকুরের পানিতে দূষণের মাত্রা পরীক্ষা করার জন্য পুকুরের সমস্ত পানি সংগ্রহ করার দরকার নেই, সেখান থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ নমুনা (sample) সংগ্রহ করে তা পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করে দেখাই বৈজ্ঞানিকভাবে অনুসরণীয় পদ্ধতি। একইভাবে সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা একটা বিশাল জনগোষ্ঠীর অংশবিশেষ থেকে জরীপের সাহায্যে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলোর ভিত্তিতে সমগ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, এরকম বিভিন্ন বক্তব্য দেওয়ার চেষ্টা করেন। সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা ঐতিহ্যগতভাবে ক্ষুদ্র পরিসরে নিবিড় এথনোগ্রাফিক মাঠকর্ম সম্পাদনের উপর জোর দিয়ে আসাতে পরিসংখ্যানবিদ্যার বিভিন্ন বিশেষায়িত কৌশলের সহায়তা নিতে তাঁদের খুব একটা দেখা যায়নি। এর অর্থ এই নয় যে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীদের কেউ কখনো জরীপ বা পরিসংখ্যান-নির্ভর অন্যান্য গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করেন না। তবে অনেক ক্ষেত্রেই সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয় বা লক্ষ্য এমন থাকে যে, সেখানে এ ধরনের পদ্ধতি খুব একটা কার্যকর বলে গণ্য করা যায় না। যেমন, কোন এলাকায় বিশেষ কোন উৎস থেকে প্রাপ্ত দূষিত পানি কতজন কি কাজে নিয়মিত ব্যবহার করে, তা মাপা সম্ভব, কিন্তু স্থানীয় প্রেক্ষিতে 'ভালো পানি' বা 'খারাপ পানি' ধরনের কোন ধারণা বিদ্যমান থাকতে পারে যেগুলো সম্পর্কে জানতে হলে নজর দিতে হবে অন্যত্র, সেখানকার সংস্কৃতির উপর। অবশ্য সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরাও জানতে চাইতে পারেন বিবিধ কাজে পুকুরের পানি কারা কতটা ব্যবহার করে, এমন কোন বিষয় সম্পর্কে। সেক্ষেত্রে যদি বিশাল কোন জনগোষ্ঠীর উপর তাঁরা কাজ করেন, তাহলে নমুনা-ভিত্তিক জরীপের সাহায্য দরকার হতে পারে।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা ঐতিহ্যগ ক্ষুদ্র পরিসরে নিবিড় এথনোগ্রাফিক মাঠকর্ম সম্পাদনের উপর জো আসাতে পরিসংখ্যানি বিভিন্ন বিশেষায়িত কৌ সহায়তা নিতে তাঁদের একটা দেখা যায় নি। এই নয় যে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীদের কেউ ক জরীপ বা পরিসংখ্যান অন্যান্য গবেষণা পদ্ধ করেন না।

ঐতিহাসিক গবেষণা

সাম্প্রতিককালে নৃবিজ্ঞানীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ঐতিহাসিক গবেষণার প্রতি মনোযোগী হয়েছেন। তাঁদের বেলায় গবেষণার অর্থ হতে পারে প্রথাগত মাঠকর্মের পরিবর্তে সরকারী মহাফেজখানাসহ বিভিন্ন স্থানে প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রের সন্ধান করা এবং সেসব দলিলপত্র পর্যালোচনা করে তথ্য সংগ্রহ করা। সংশ্লিষ্ট সময়কালের সরকারী নথিপত্র থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত দিনপঞ্জী, চিঠিপত্র সব ধরনের দলিলই ঐতিহাসিক গবেষণায় তথ্যের 'উৎস' হিসাবে গণ্য হতে পারে। তবে এসব উৎস খুঁজে বের করতে পারা গবেষণার প্রাথমিক ধাপ মাত্র, সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হল উৎসসমূহ ভাল করে পরীক্ষা করে প্রাপ্ত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা, এবং বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত খন্ডচিত্রসমূহ মিলিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যতটা সম্ভব একটা পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দাঁড় করানো। অতীতে যখন প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের সাহায্যে তথাকথিত আদিম সমাজসমূহ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উপর নৃবিজ্ঞানে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হত, তখন অনেক নৃবিজ্ঞানীরই লক্ষ্য ছিল আদি-অকৃত্রিম অবস্থায় রয়ে গেছে, এমন জনগোষ্ঠীর সন্ধান করা। আর ঔপনিবেশিকতার প্রভাবে সূচিত কোন পরিবর্তন যদি নৃবিজ্ঞানীদের চোখেও পড়ত, সেগুলোর প্রতি তাঁরা যথেষ্ট আগ্রহ বা মনোযোগ দেখান নি। সাম্প্রতিককালের ইতিহাস-মনস্ক সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা তাই অনেকেই পরীক্ষা করে দেখছেন, তাঁদের পূর্বসূরীদের বর্ণিত তথাকথিত আদিম সমাজসমূহ আসলেই কতটা আদি ও অকৃত্রিম অবস্থায় ছিল। এ ধরনের গবেষণা থেকে সাধারণভাবে এই উপলব্ধি ব্যাপকতা

প্রথাগত নৃবৈজ্ঞানিক প্রাক-ঔপনিবেশিক যু সনাতনী বাস্তবতা হি বিবরণ দেওয়া হয়েছে অনেকক্ষেত্রে আসলে ঔপনিবেশিক সময়ক বাস্তবতাকেই নির্দেশ ধরনের উপলব্ধি অনে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী ঐতিহাসিক গবেষণার আগ্রহী করে তুলেছে।

পেয়েছে যে, প্রথাগত নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগের সনাতনী বাস্তবতা হিসেবে যেসব বিবরণ দেওয়া হয়েছে, সেগুলো অনেকক্ষেত্রে আসলে ঔপনিবেশিক সময়কালের বাস্তবতাকেই নির্দেশ করে। এ ধরনের উপলব্ধি অনেক সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীকে ঐতিহাসিক গবেষণার প্রতি আগ্রহী করে তুলেছে।

গবেষণার রাজনৈতিক ও নৈতিক দিক

'গিনি পিগ' কথাটার সাথে আপনি নিশ্চয় পরিচিত। গবেষণাগারে গিনি পিগের মত প্রাণীদের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয় মানুষের প্রয়োজনে। এ ধরনের গবেষণার নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন করার লোক একেবারে বিরল নয়, যদিও সংখ্যায় তারা কম। কিন্তু যদি এমন কথা শোনা যেত যে সামাজিক গবেষণার নামে জীবন্ত মানুষদেরই 'গিনিপিগ' বানানো হয়েছে, তাহলে সেটা নিশ্চয় কারো কাছে নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হত না। সামাজিক বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণায় মানব সমাজের উপর এ ধরনের কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান না ঠিকই, তবে অনেকসময় পরোক্ষভাবে তাঁরা এ ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষায় অংশ নিয়ে থাকেন। যেমন, আপনি নিশ্চয় জানেন, বাংলাদেশসহ বিশ্বের বহু স্থানে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে। এসব প্রকল্প অনেকক্ষেত্রেই হয়ে থাকে পরীক্ষামূলক, যেগুলোর প্রয়োজনীয়তা বা যৌক্তিকতা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। এমনটা অনেক সময়ই দেখা যায় যে, সমাজের কোন প্রভাবশালী গোষ্ঠী চায় বিশেষ কোন প্রকল্প বাস্তবায়িত হোক, কারণ তারা এতে নিজেরা লাভবান হবে, অন্যদিকে সেই প্রকল্পের বাস্তবায়ন অন্যদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ধরা যাক, এ ধরনের কোন বিতর্কিত প্রকল্প মূল্যায়নের কাজে একজন সামাজিক বিজ্ঞানীকে সম্পৃক্ত করা হল। তিনি কাদের পক্ষ অবলম্বন করবেন? নীতিগতভাবে সামাজিক বিজ্ঞানী অবশ্যই নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে একটা বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন তুলে ধরবেন। কিন্তু সামাজিক বিজ্ঞানীরাও যেহেতু সমাজেরই অংশ, তাঁদেরও বিশেষ কোন মূল্যবোধ, মতাদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে পারে যা গবেষণার ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে। এ ধরনের বিষয় বিবেচনা করে অনেক সামাজিক বিজ্ঞানীই মনে করেন যে, বস্তুনিষ্ঠ বা মূল্যবোধ-নিরপেক্ষ সামাজিক গবেষণা বলে আসলে কিছু নেই, থাকতে পারে না। এ ব্যাপারে ভিন্নমতের অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে, যে বৃহত্তর সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সামাজিক গবেষণা পরিচালিত হয়, তা পরীক্ষা করে দেখা সামাজিক বিজ্ঞানীদের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

ক বিজ্ঞানীরাও যেহেতু জেরই অংশ, তাঁদেরও শেষ কোন মূল্যবোধ, র্শ বা দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে গবেষণার ফলাফলকে ভাবিত করতে পারে।

সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা যেহেতু ঐতিহ্যগতভাবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তিক ও অপেক্ষাকৃত দুর্বল জনগোষ্ঠীদের মাঝে গবেষণা করেছেন, উপরের প্রশ্নগুলো তাঁদের জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। অনেক সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীই মনে করেন যে তাঁরা একধরনের সাংস্কৃতিক অনুবাদকের ভূমিকা পালন করেন। ঐতিহাসিকভাবে এই ভূমিকাটা হয়েছে একমুখী, অর্থাৎ পশ্চিমা নৃবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন অপশ্চিমা জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে বোধগম্য করে তুলেছে নিজেদের সমাজে, কিন্তু এর উল্টো ভূমিকা তাঁরা সাধারণভাবে পালন করেননি। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে অনেক নৃবিজ্ঞানীই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার জন্য ফরমায়েশী গবেষণার কাজ করেছেন। এ ধরনের গবেষণায় নৃবিজ্ঞানীরা সাধারণতঃ মনে করেন যে তাঁরা গবেষণা এলাকার জনগোষ্ঠীদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন, অনেক সময় তাঁরা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীদের মুখপাত্র হিসাবেও নিজেদের গণ্য করেন। তবে ইদানীং নৃবিজ্ঞানীদের মাঝে এই উপলব্ধি বিস্তৃতি লাভ করেছে যে, কোন জনগোষ্ঠী, সেটা আয়তনে যত ক্ষুদ্র বা সামাজিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে যত সরলই হোক না কেন, আসলে সম্পূর্ণ সমরূপ না। কাজেই নৃবিজ্ঞানীরা যেটাকে স্থানীয় দৃষ্টিভঙ্গী হিসাবে তুলে ধরছেন, সেটা যে অনেক সময় স্থানীয় মানুষদের শুধু একটা অংশেরই দৃষ্টিভঙ্গী হতে পারে

(স্থানীয় প্রেক্ষিতে ক্ষমতাবানদের, পুরুষদের, ইত্যাদি), এই সম্ভাবনাও তলিয়ে দেখার তাগিদ স্বীকৃতি পেয়েছে। স্পষ্টতই, নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণায় এধরনের অনেক বিষয় বিবেচনায় নেওয়া পদ্ধতিগতভাবে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি রাজনৈতিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও জরুরী, যাতে করে গবেষকের একটা স্বচ্ছ ধারণা থাকে গবেষণার সার্বিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে।

সারাংশ

প্রতিটা জ্ঞানকান্ডেই নির্দিষ্ট কিছু গবেষণা পদ্ধতি রয়েছে। এক্ষেত্রে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানেরও রয়েছে নিজস্ব কিছু গবেষণা পদ্ধতি, যেগুলোর মধ্যে এথনোগ্রাফিক মাঠকর্ম ও তুলনামূলক পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে 'মাঠ' বলতে বোঝায় এমন কোন স্থান বা এলাকা যেখানে গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেখানে বসবাসরত মানুষদের কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করার এবং তাদের সাথে মেশার, কথা বলার সুযোগ রয়েছে। এভাবে পর্যবেক্ষণ ও কথোপকথন, সাক্ষাতকার প্রভৃতি কৌশল ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিকে মাঠকর্ম বা মাঠ গবেষণা বলা হয়। আন্তঃসাংস্কৃতিক তুলনা (cross-cultural comparison) সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের একটি অন্যতম গবেষণা পদ্ধতি। মানব জীবনের বিশেষ কোন দিক ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিতে কি রূপে বিরাজমান ও ক্রিয়াশীল থাকে, তা নৃবিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত এথনোগ্রাফিক তথ্যের আলোকে। বৃহদায়তনের কোন সমাজে গবেষণা করতে গেলে সামাজিক বিজ্ঞানীরা প্রায়ই জরীপের সাহায্য নিয়ে থাকেন। সাম্প্রতিককালে নৃবিজ্ঞানীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ঐতিহাসিক গবেষণার প্রতি মনোযোগী হয়েছেন। প্রথাগত মাঠকর্মের পরিবর্তে সরকারী মহাফেজখানাসহ বিভিন্ন স্থানে প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রের সন্ধান করা এবং সেসব দলিলপত্র পর্যালোচনা করে তথ্য সংগ্রহ করা। নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণায় অনেক বিষয় বিবেচনায় নেওয়া পদ্ধতিগতভাবে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি রাজনৈতিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও জরুরী, যাতে করে গবেষকের একটা স্বচ্ছ ধারণা থাকে গবেষণার সার্বিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন -

১। মালিনফস্কির মতে নৃবৈজ্ঞানিক মাঠকর্মের প্রধান উদ্দেশ্য কি?
ক. কোন এলাকায় কমপক্ষে একবছর সময় কাটানো
খ. একটি ভিন্ন ভাষা শিখা
গ. লোকজনের সাথে মেলামেশা করা
ঘ. কোন জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে তাদের মত করে বোঝার চেষ্টা করা

২। এথনোগ্রাফিক মাঠকর্মে তথ্য সংগ্রহের প্রধান কৌশল হচ্ছে:
ক. স্থানীয় বিভিন্ন মানুষের জীবন ইতিহাস সংগ্রহ করা
খ. অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ
গ. সাক্ষাতকার গ্রহণ
ঘ. প্রধান তথ্যদাতাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা

৩। ঐতিহ্যগতভাবে জরীপধর্মী গবেষণা নৃবিজ্ঞানে কম হয়েছে, কারণ:
ক. নৃবিজ্ঞানের বিকাশ কালে কোন জ্ঞানকান্ডেই জরীপধর্মী গবেষণার রেওয়াজ ছিল না
খ. এই পদ্ধতির গবেষণা বৃহদায়তনের সমাজ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু নৃবিজ্ঞানীরা সচরাচর গবেষণা করেছেন ক্ষুদ্রতর পরিসরে
গ. জরীপের চাইতে এথনোগ্রাফিক মাঠকর্ম অনেক সহজ
ঘ. জরীপের চাইতে এথনোগ্রাফিক মাঠকর্ম অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য গবেষণা পদ্ধতি

৪। নৃবিজ্ঞানীরা সাম্প্রতিককালে ঐতিহাসিক গবেষণায় আগ্রহী হয়েছেন কেন?
ক. ঐতিহাসিক দলিলপত্র সহজলভ্য হয়ে যাওয়াতে
খ. মাঠকর্মের সুযোগ কমে যাওয়াতে
গ. ইতিহাস-বিযুক্ততা প্রথাগত নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণাকে বিভিন্নভাবে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিল, এই উপলব্ধি ব্যাপকতা পাওয়াতে
ঘ. উপরের কোনটিই না

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। জরিপ পদ্ধতি কী?
২। সাম্প্রতিক সময়ে কেন নৃজিজ্ঞানীরা ঐতিহাসিক গবেষণার প্রতি মনোযোগী হয়েছেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে মাঠকর্মের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব আলোচনা করুন।

২। এথনোগ্রাফিক মাঠকর্ম ছাড়া সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে অন্য কি ধরনের গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়? বিস্তারিত আলোচনা করুন।

৩। সামাজিক গবেষণায় কোন্ প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক ও নৈতিক বিষয়াবলী বিবেচনায় নেওয়া দরকার? সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে উত্তর দিন।